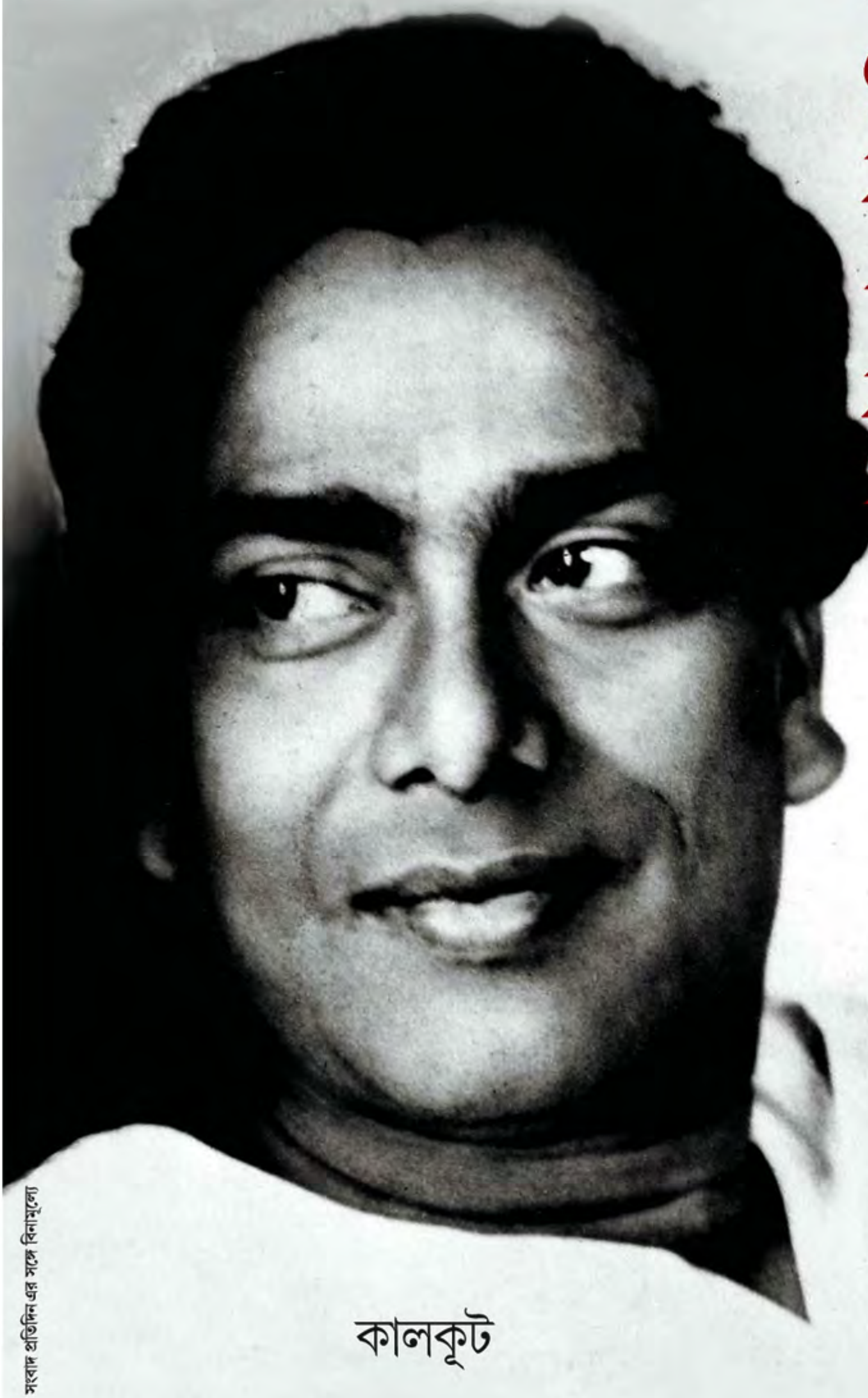
সংবাদ প্রতিদিন

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০

রোববার



কালকূট

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

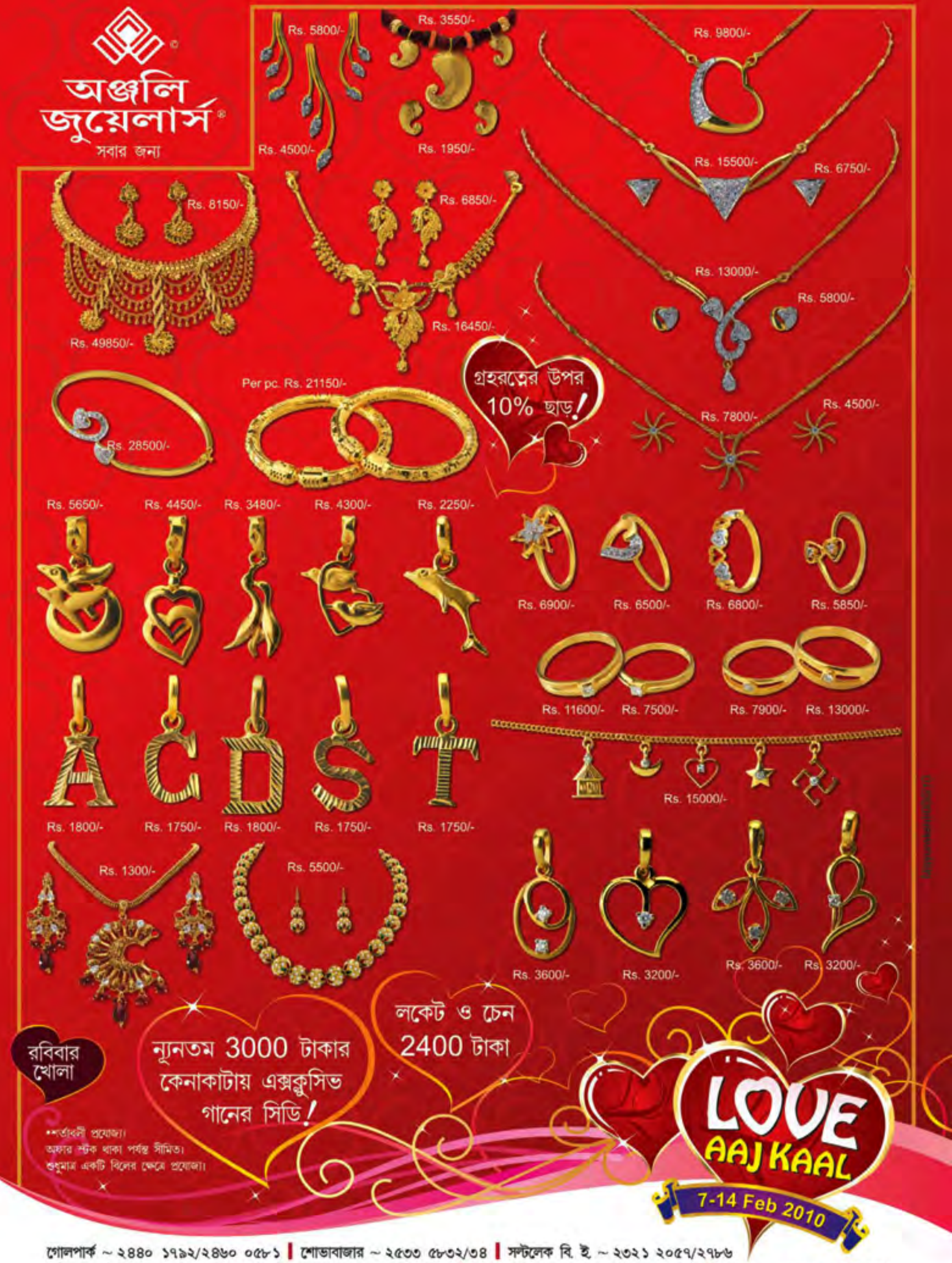


পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com



গোলপার্ক ~ ২৪৪০ ১৭৯২/২৪৬০ ০৫৮১ | শোভাবাজার ~ ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪ | সল্টলেক বি. ই ~ ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬
সল্টলেক এইচ. এ ~ ২৩২১ ৮৩১০/১১ | বেহালা ~ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ | হাওড়া পঞ্চাননতলা ~ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ | বারাসাত ~ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই। দোকান প্রত্যহ সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৯.০০ পর্যন্ত খোলা।

Help Line

গোলপার্ক ~ ৯৮৩০৪ ৫৬৪৮৬ (প্রেমেন্দু সাধুখাঁ), শোভাবাজার ~ ৯৮৩৬০ ০১০১২ (জয়ন্ত বোস), সল্টলেক বি. ই ~ ৯৮৩০৮ ৭৮৩৩৪ (সন্দীপ মিত্র)
সল্টলেক এইচ. এ ~ ৯৮৩০৪ ৯৫৭৫২ (শঙ্কর ঘোষ), বেহালা ~ ৯৮৩৬০ ০১০১৭ (শিবাজী সরকার), হাওড়া পঞ্চাননতলা ~ ৯৮৩০৪ ৫১৪৯২ (সুস্মিত বসু)
বারাসাত ~ ৯৮৩৬০ ৬৬০৬৭ (রতন হালদার)

*সোনার দামের পরিবর্তনের সঙ্গে এবং গয়নার ওজনের তারতম্যে, গয়নার দাম পরিবর্তনসাপেক্ষ।

www.anjali.bz

প্রতিদিন

রোববার

ছবি ও প্রচ্ছদ সৌজন্য : উদিত বসু

সৌজন্য : দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশন

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী, বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, বিপুল গুহ, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী রাজু সরদার, শান্তনু দে, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে



মনে পড়ছে না সঠিক। তবে আবছা যতটুকু মনে করতে পারছি, আমার জীবনে শোনা প্রথম ছদ্মনাম বোধহয় 'স্বপনবুড়ো'। ছোট ছেলেপুলের গল্প-বলা বন্ধু। সেই বয়সে, যে-বয়সে সান্তাক্লজ সত্যি, অরণ্যদেব সত্যি, জাদুকর ম্যানড্রেক সত্যি—'স্বপনবুড়ো' নামের আড়ালে যে অন্য কোনও মানুষ আছেন; সে সন্দেহও হয়নি ক্ষণেকের জন্য।

তারপর, বয়স বাড়ল। জরাসন্ধ, কালকূট, নীললোহিত, রূপদর্শী-রা সার দিয়ে এসে জমা হলেন বইয়ের তাকে। ততদিনে নামগুলোর পিছনের মানুষগুলোকে চিনি। এমনকী, 'স্বপনবুড়ো'-ও যে আদতে অখিল নিয়োগী, তা-ও জেনে গিয়েছি।

'কালকূট' নামটার একটা বাৎসরিক পুনরাবৃত্তি ছিল, প্রায় রেডিও-র 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র মতোই। সেটা বছরে-বছরে শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত নতুন-নতুন উপন্যাসের জন্য নয়। প্রধানত জানুয়ারির গোড়ার দিকে যখন হিমেল হাওয়া দিত, খবরের কাগজে কুম্ভমেলার প্রস্তুতির, সাধু-সমাগমের ছবি ছাপা হত বড় বড় করে, আমাদের মতো, জানি না অনেক বাঙালি বাড়িতেই বোধহয়, ফিরে-ফিরে আসত সেই অমোঘ নামটা—'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'।

উপন্যাসটার আখ্যানাংশ যে সবার মনে সদাজাগরুক হয়ে ছিল এমন নয়, কিন্তু নামটার মধ্যে এমন একটা ছন্দঝংকার নিহিত ছিল, যেটা উচ্চারণ করলেই যেন কুম্ভ-দর্শনের পুণ্য অর্জন করতেন অনেক বাঙালি পাঠক।

কালকূট-এর 'কোথায় পাব তারে'-ও বড় চমৎকার নাম। উপন্যাসটার কথা ছেড়েই দিচ্ছি।

তা সত্ত্বেও কেমন করে যেন বাঙালির পুণ্যপ্রীতি, আর সাহিত্যপ্রেমের মাঝখানে পড়ে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' বইটা একটা পবিত্র-বই হয়ে গেল বাঙালি জীবনে।

পৌষ সংক্রান্তির সঙ্গে আমরা সাধারণভাবে অনেক চেনা জিনিস খুঁজে পাই—পিঠেপুলি, গঙ্গাসাগর, জমিয়ে শীত... ইত্যাদি অনেক কিছু।

কিন্তু অবচেতনের ভিতর থেকে যে শব্দবন্ধ আজও এসে পৌষ সংক্রান্তিকে কাব্যময় করে দেয় বাঙালির জীবনে তা বোধকরি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'।

আজ তাই পৌষ-শেষের এই 'রোববার' আমরা নামাঙ্কিত করলাম সেই অমোঘ স্রষ্টার নামে—যিনি কালকূট, এবং সেই অমৃতগ্রন্থের রচয়িতা।

সমরেশ বসু-র কথাও নিশ্চয় পরে একদিন ভাবব।

শুভেচ্ছা।







পরিচয়, ভাল লাগা বইটির সঙ্গে

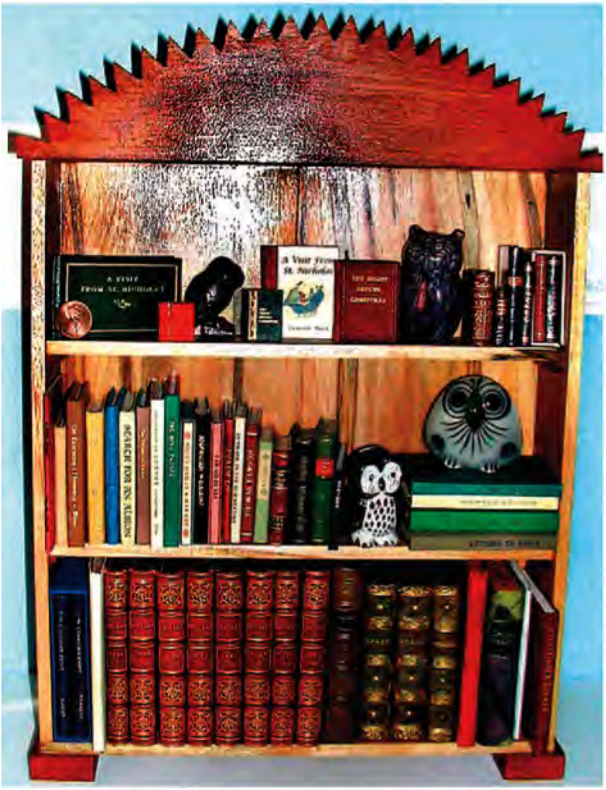
মন্ত্রীমশাই ষড়যন্ত্রী-মশাই ব্রেকফাস্ট সেরে অঙ্গে ধারণ করে পরিপাটি পরিধান দাঁড়ালেন আর্শির সামনে। আরও একটি ছকাশ্রিত কাজের দিন শুরু হতে চলেছে। প্রতিদিনের মতো নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রীমশাই মুখেচোখে সারা শরীর-ভাষায় সেই ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন যাতে মনে হয় তিনি সৎ, তিনি দয়ালু, তিনি পরোপকারী, তিনি উদার, এবং তিনি ধর্মপ্রাণ। এই শেষ গুণটিই সব থেকে জরুরি, আপাত গদগদ ভাব না-থাকলে প্রকৃত শয়তান হওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে তিনি শাসক। শাসন করার দু'টি উপায়। এক, আইনসম্মত ভাবে। দুই, জোর-যার-মুল্লুক-তার উপায়ে। প্রথম উপায়টি মানুষের। দ্বিতীয়টি জন্তুর। মন্ত্রীমশাই জানেন, উত্তম শাসক হতে হলে নখেদাঁতে-স্বভাবে জন্তুই হওয়া উচিত, যদিও ওপরে বজায় রাখতে হবে ধর্মপ্রাণ গরিববন্ধু ভাবটি। এই মোক্ষম বীজমন্ত্র যেন সদাজাগ্রত থাকে প্রাণে যে, সাধারণ মানুষ অতীব ত্যাঁদড়, হারামির জাত, তাদের উপকার করা মানে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা।

There are two ways of ruling : by law or by brute force. The first way is natural to men. The second to beasts. But as the first way often proves inadequate, one must needs have recourse to the second, লিখেছেন ম্যাকিয়েভেলি (১৪৬৯-১৫২৭), ১৬শো শতকে। যদি জন্তু হতেই হয়, তবে শাসককে হতে হবে কোন জন্তুর মতো? এ-প্রশ্নের উত্তরে সৎ, সাহসী ও স্বচ্ছ ম্যাকিয়েভেলি, He should learn from the fox and the lion. The lion is defenceless against traps and a fox is defenceless against wolves. Therefore one must be a fox in order to recognize traps, and a lion to frighten off wolves. Those who simply act like lions are stupid. সিংহ কোথায় কেমনভাবে ফাঁদ পাতা বুঝতে পারে না। শেয়ালের মতো ধূর্ত হতে হবে সেটা বুঝতে গেলে। আবার শেয়াল নেকড়েদের সামনে অসহায়। নেকড়ে তাড়াতে সিংহ হতে হবে। যে-শাসক শুধুই সিংহের মতো হওয়ার চেষ্টা করে সে স্রেফ হাঁদা। কিন্তু এই সিংহ-শেয়াল মেশানো শাসকের রাজত্বে কী হবে সাধারণ মানুষের হাল? এক কথায় উত্তর দিয়েছেন ম্যাকিয়েভেলি তাঁর চটিগ্রন্থ 'দ্য প্রিন্স'-এ, Because men are wretched creatures who would not keep their word to you, you need not keep your word to them.

'দ্য প্রিন্স' প্রথম পড়ি ছাত্রজীবনে। দারুণ লেগেছিল ম্যাকিয়েভেলি-র ন্যাকামিবর্জিত বলবান গদ্য পড়তে। কিন্তু তাঁর স্বাদু শয়তানসাধনার মহিমার অনুধাবন করতে পারিনি কাঁচা বয়েসে। পারছি এখন, যতই অভিজ্ঞ ও পরিণত হচ্ছি বর্তমান পরিবহে। সমকালের প্রেক্ষিতে প্রায় পাঁচশো বছর আগে লেখা 'দ্য প্রিন্স' এমন একটি বই যা খাটের পাশে টেবিলটিতে না-রেখে উপায় নেই। এ-বই প্রত্যহ গীতাপাঠের মতো পড়া উচিত, The ruler should appear a man of compassion, a man of good faith, a man of integrity, a kind and a religious man. And there is nothing so important as to seem to have this last quality. ধর্মভীরু ভাবটি বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন, বারবার বলছেন ম্যাকিয়েভেলি। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেন শাসককে কখনও দুর্বল না ভাবে। সাধারণ মানুষের ভালবাসা পেয়ে লাভ নেই। অর্জন করতে হবে তাদের ভয়। It is far better to be feared than to be loved, লিখেছেন ম্যাকিয়েভেলি। যাকে ভালবাসা যায় তার ক্ষতি করতে সাধারণ মানুষ দু'বার ভাববে না। কিন্তু যে-শাসককে মানুষ ভয় পায়, তার ক্ষতি কেউ সহজে করবে না, Men worry less about doing an injury to one who makes himself loved than to one who makes himself feared. সাধারণ মানুষ অতীব জঘন্য জীব। তারা নিজেদের স্বার্থে ভালবাসার বন্ধন মুহূর্তে ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু যার ক্ষতি করতে মারাত্মক শাস্তি পেতে হবে, তার ক্ষতি সাধারণ মানুষ করতে চায় না। ভালবাসা দিয়ে শাসন করা যায় না। যায় ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে। The bond of love is one which men, wretched creatures that they are, break when it is to their advantage to do so. শাসকের পক্ষে নিষ্ঠুরতার অপবাদ তাই অনেক ভাল।

ম্যাকিয়েভেলি-র এই অৰ্চিষ্মান শয়তানশীলন আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই শয়তানকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। তাকে পদে-পদে চিনতে বাধ্য আমরা। নতজানু আমরা তার মহিমার কাছে। যেদিকে তাকাই তার মহিমাবৃত্ত থেকে বেরবার উপায় নেই আমাদের। যতই জানছি এই ম্যাকিয়েভেলিয়ান শয়তানকে, ততই কি জানতে ইচ্ছে করে না ম্যাকিয়েভেলি-কেও? কেমন ছিল তাঁর জীবন? তিনি নিজেও কি ছিলেন শয়তান? যিনি শয়তানির উপদেশে এমন অনর্গল এবং নির্ভুল, তাঁর নিজের পতন ও নির্বাসন হয়েছিল কেন? শেষ জীবন কেটেছিল কীভাবে? ম্যাকিয়েভেলি জন্মেছিলেন ইতালির ফ্লোরেন্স-এ ১৪৬৯-এ। হয়েছিলেন ফ্লোরেনটাইন রিপাবলিক-এর সেক্রেটারি এবং সেকেন্ড চ্যান্সেলর। ক্ষমতার আসনে ছড়ি ঘুরিয়েছিলেন অনেকদিন। নিজেই তৈরি করেছিলেন সৈন্যবাহিনী। এই বাহিনীর পরাজয় ঘটলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। শেষ বয়সে শহর থেকে দূরে স্ত্রী আর ছয় সন্তানকে নিয়ে ফার্ম-হাউসে থাকতেন। পারিবারিক জীবনেও একা হয়ে গিয়েছিলেন। ডুবে থাকতেন লেখাপড়ায়। ১৫১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর বন্ধু ফ্রান্সেসকো ভেত্তোরি-কে একটি চিঠিতে নিজের জীবন সম্পর্কে জানান ম্যাকিয়েভেলি : সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম ভাঙে আমার। প্রথমেই যাই যেখানে কাঠুরেরা আমার জন্য কাজ করছে। দেখি তাদের কাজ কতটা এগলো। মধ্যে-মধ্যে পড়ি দান্তে অথবা পেত্রার্ক অথবা ওভিড। কোনও নিরিবিলি জায়গায় বসে আমার জীবনে যে প্রেমিকারা এসেছিল তাদের কথা ভাবি, ভাবি অতীত

রোমান্সের কথা। তারপর কোনও সরাইখানায় যাই পানাড্ডার টানে। রাতের খাওয়াদাওয়াটা বাইরেই সারি। ফিরে আসি সরাইখানায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাস-পাশা খেলে সময় কাটাতে। রাত করে বাড়ি ফিরি। জামাকাপড় ছেড়ে রাতের পোশাক পরে পড়ার ঘরে যাই। সেখানে একা বসে অতীতের বন্ধুদের সঙ্গে রাজনীতি, ক্ষমতার লড়াই ইত্যাদি বিষয়ে মনে-মনে কথা বলি। কল্পনায় তাদের কাছ থেকে অনেক কূটনৈতিক উপদেশ পাই। কল্পনায় পাওয়া শয়তানির এইসব উপদেশ থেকেই ম্যাকিয়েভেলি লিখলেন 'দ্য প্রিন্স'। ঢুকলেন শয়তানির যত গভীরে ঢোকা যায়, তত দূর পর্যন্ত! এবং অমর করে গেলেন ম্যাকিয়েভেলিয়ান ভিলেনকে! যে যুগে-যুগে আমাদের রক্ষক ও ভক্ষক।



কেমন দেখতে ছিল ম্যাকিয়েভেলি-কে? তিনি কি ছিলেন এক ভয়ঙ্কর-দর্শন পুরুষ? না কি মিল্টন-এর শয়তানের মতো সুন্দর? ম্যাকিয়েভেলি-র যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তা এইরকম : খুব লম্বাও না, বেঁটেও না, মাঝারি উচ্চতার মানুষ। একহারা চেহারা। উজ্জ্বল চোখ। কালো চুল। মাথাটি দেহের তুলনায় ঈষৎ ছোট। ঈগলের ঠোঁটের মতো নাক। চাপা ঠোঁট। মানুষটি মনোযোগের সঙ্গে দেখেন, গভীরভাবে ভাবেন। ঠোঁটের কোণে আঁকা বিদ্রুপের ভাবটি থেকে বেরতে পারেন না। ওঁর চোখ দেখলে মনে হয় সব সময়ে হিসেব করছেন। কিন্তু কল্পনাশক্তিও প্রবল। রোমান্টিক নন অথচ নিঃসন্দেহে অসামান্য দূরদৃষ্টির অধিকারী।

পরিশ্রম করার এবং কষ্ট সহ্য করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ম্যাকিয়েভেলি-র। চল্লিশ বছর বয়েসে যে-রিপাবলিকের ক্ষমতাশীর্ষে উঠেছিলেন তিনি, সেই রিপাবলিক ধ্বংস হল; ক্ষমতাচ্যুত, নির্বাসিত এবং অত্যাচারিত হলেন ম্যাকিয়েভেলি। আর কোনওদিনই ফিরতে পারেননি হারানো ক্ষমতায়। সব থেকে কষ্ট পেয়েছেন তাঁর ভালবাসার ফ্লোরেন্স থেকে দূরে মানসিক একাকিত্বে, রাজনৈতিক অবসরকে কাজে লাগিয়েছেন একটির পর একটি বই লিখে। 'দ্য প্রিন্স' তাঁর মাস্টারপিস। এছাড়াও লিখেছেন 'আর্ট অফ ওয়ার', 'ডায়ালগ অন ল্যাঙ্গুয়েজ', 'হিস্ট্রি অফ ফ্লোরেন্স'।

পারিবারিক জীবনে সম্ভবত সুখী হতে পারেননি ম্যাকিয়েভেলি। চৌত্রিশ বছর বয়েসে মারিয়েত্তা করসিনি নামের এক কন্যাকে বিয়ে করেন। ছয় সন্তানের জনক হন তিনি। কিন্তু ক্রমশই ক্ষমতার লিপ্সা গ্রাস করে ম্যাকিয়েভেলিকে। পরিবারের কাছ থেকে দূরে সরে যান। মাঝে-মধ্যে বেশ্যাগৃহেও যেতেন। বন্ধু ভেত্তোরি-র কাছে তাঁর জীবনে এক কুৎসিত বেশ্যার কথা তিনি নিজেই বেশ রসিয়ে বলেছেন। ক্ষমতাচ্যুত নিঃসঙ্গ ম্যাকিয়েভেলি তাঁর ফার্ম-হাউসে স্ত্রী আর ছয় সন্তানের কাছে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু এই প্রত্যাবর্তনে কোনও আবেগ বা প্রেম ছিল না। তিনি গড়ে তুললেন তাঁর নিজের ভাবনার জগৎ—যে-জগতে প্রবেশের অধিকার পায়নি তাঁর পরিবার। এক নিঃসঙ্গ উদ্ধত সুপণ্ডিত—ম্যাকিয়েভেলি-র আশপাশের লোকজন তাঁকে এইভাবেই জানত।

ম্যাকিয়েভেলি-কে আমার মূলত ভাল লাগে বিশুদ্ধ শয়তানির প্রচারক ও প্রবক্তা হিসেবে। তাঁর শয়তানসিদ্ধি উত্তীর্ণ কালাতীত ব্যঞ্জনায়। শয়তানির প্রচারে তিনি কোনও বিশেষ কাল বা স্থানের নন। তাঁর উপদেশ আজও সমান ভাস্বর। ম্যাকিয়েভেলি-র শয়তানসংহিতা আমাকে মুগ্ধ করে সেই সব উপদেশমালার জন্য যার কোনও ফুল আজও বাসি হয়নি। যেমন, যতরকম শয়তানি করার করে যাও হে শাসক, শুধু দু'টি ভুল কখনও কোরো না। এক, গরিব মানুষের জমি কেড়ে নিও না। হাত দিও না তাদের সামান্য সম্বলে। দুই, হাত দিও না তাদের মেয়েমানুষের গায়ে। He will be hated above all if he is rapacious and aggresive with regard to the property and the women of his subjects. সম্পত্তি আর মেয়েমানুষের গায়ে হাত পড়লে আন্দোলন হবেই। এবং হে শাসক, সে আন্দোলন সামলাবার ক্ষমতা তোমার নেই, তুমি যত বড় শয়তানই হও না কেন। পতন তোমার তখন অনিবার্য!

দ্য প্রিন্স ● ম্যাকিয়েভেলি

হাঁউ মাউ খাঁউ

আমার ছোটবেলায় বাবার বন্ধুদের গল্প শুনে শুনে আমার ধারণা ছিল, যে বাবার বন্ধু মাত্রেই আস্ত পাঁঠা খেতে পারেন! কিন্তু আমি জীবনে কাউকেই সেই কাজটি করতে দেখিনি। তবে দাদাভাই আর সুকুমামাকে তাদের নবযৌবনকালে পাল্লা দিয়ে খাওয়ার অসাধ্যসাধন করতে দেখেছি ভোজবাড়িতে। আমরা ভাইবোনেরা সবাই বিমোহিত এবং গর্বিত ছিলুম দাদাদের এই পারঙ্গমতায়!

এরপর এল শিবু—শিবুর নেমন্তন্ন খাওয়ার গল্প আমাদের শুনতে খুব ভাল লাগত। কী খেলি শিবু? ঝোপঝাড় কিছু খাইনি দিদি, ঝাড়াঝাপ্টা। চারটি ভেটকি ফ্রাই আর পাঁচ পিস কালিয়ার রুইমাছ, চারটে চিংড়ি। ব্যস। মোটে দু'বারই মাংস নিয়েছি, মিষ্টিগুলো ভাল ছিল বলে পেটে জায়গা রাখছিলুম। মিষ্টি কী কী খেলি? ওই তো আটটা রসগোল্লা পাঁচটা লেডিকেনি, দই আর নিইনি চারটে আইসক্রিম। শিবু কিন্তু অসংযমী নয়, এখন শরীর বুঝে খুব নিয়মিত আহার করে, একটুও লোভ করে না, অ্যালার্জি, শর্করা ও কোলেস্টেরলের হিসেব মাফিক খায়। তবে এগুলো ওর না হলেই ভাল ছিল।

আমরা যখন মা-বাবা হলুম তখন আমাদের আড্ডাতে ভোজনবিলাসীদের অহংকারের ঠাঁই রইল না। ও সব 'গারগানতুয়ান' খাওয়াদাওয়া দানবিক রুচির মধ্যযুগীয় কাণ্ড। আমরা স্বাস্থ্যসচেতন, বেশি খেলে লোকে আর ইমপ্রেস্‌ড হয় না। হিতে বিপরীত হয়। এবং লোক দেখিয়ে খাদ্য নষ্ট করার প্রশ্নই নেই। এখন কায়দা হল রেসিপির নতুনত্বে।

গুনিয়াভাই ছিল আমার মায়ের সংসারের সব সমস্যার সমাধানের সূত্র। বাবার মতো খাওয়াতে ভালবাসত সেও। একবার খুব ভাল টাটকা মাছ এনেছে, নিমন্ত্রিতেরা জিগ্যেস করলেন, কত করে পেলে? গুনিয়া সগৌরবে বললে, আড়াই টাকা সের। অতিথিরা অবাক, সে কী? আমরা তো পাঁচ টাকাতে কিনছি। তুমি আদ্দেক দামে পেলে? মাছওলাটা যে আমার বন্ধু। ও, তাই? আমাদের জন্যেও এনে দিও তো? নিশ্চয়ই দেব। অতিথি টাকা দিয়ে গেলেন দু'সের মাছের। গুনিয়াভাই মহানন্দে তাঁকে পাঁচ টাকাতে দু'সের মাছ দিয়ে ধন্য ধন্য প্রশংসা শুনে হিরো হয়ে উজ্জ্বল মুখে ফিরে এল। তারপরে মায়ের কাছে মাইনে থেকে অগ্রিম টাকা চাইল। বন্ধুর দোকানেও দামটা দশ টাকাই লাগে কি না?

আমি মাঝে মাঝে আমার খারাপ রান্নার গল্প লিখি। কিন্তু তা বলে যে চিরকালই খারাপ রেঁধেছি তা নয়। রান্নার রেসিপির বই জমানোর নেশা ছিল এককালে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি আমি দিল্লিতে চিনে রান্না করে নেমন্তন্ন খাওয়াতুম, সেটা তখনও কোথাওই চালু ছিল না। গৌরীদি আর নেই, কিন্তু এখনও আমার চিনে রান্নার প্রশংসা করে এমন আরেকজন সাক্ষী আছে, আমার বন্ধু তারা, মানে উত্তরা বসু। পুরুষমানুষদের তো কে কী রাঁধল খাওয়াল কিছুই মনে থাকে না। কলকাতার চিনেপাড়া থেকে আজিনোমোতো, কর্নফ্লাওয়ার, সয়া সস, বড় বড় শুকনো কালো চিনে মাশরুম, ছোট ছোট চিনে শুকনো লঙ্কা, আর অনুপান হিসেবে জুঁইফুলের চা কিনে নিয়ে যেতুম দিল্লিতে। তখনও ওখানে এসবের দোকান ছিল না, দিল্লিতে চিনে রেস্তোরাঁও ছিল না ভাল। 'চাও' বলে আর 'চিলি চিকেন' বলে কোনও খাদ্য নামেনি কলকাতার ফুটপাথে। এখন ভুবনগ্রামের ভারতবর্ষে সেদিনের ব্যাপারটার অভিনবত্ব বোঝা কঠিন।

আমার ক্লাসমেট অশোকের স্ত্রী খুব খাওয়াতে ভালবাসেন। রান্না করেন অসাধারণ আর আতিথেয়তার ধরনটি সামান্য অমানবিক। অশোকের মুখে শোনা একটি গল্প বলি ইন্দ্রাণীর আতিথেয়তার—মধুপুরে তাঁরা উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন। অনেকদিন আগের কথা—ওঁরা তখন তরুণ দম্পতি। কলকাতার দুই বয়স্ক মানুষের সঙ্গে বাজারে দেখা, ইন্দ্রাণী



নেমন্তন্ন করে ফেললেন। সকালে উঠে অশোককে মধুপুরে ঠান্ডায় বেরিয়ে সেরা মাছ, মাংস তো আনতেই হল, এছাড়া স্পেশাল গয়লার কাছ থেকে স্পেশাল দুধ নিয়ে আসতে হল—ইন্দ্রাণী পুডিং করবেন। যথাসময়ে টাঙ্গা চড়ে অতিথিদ্বয় হাজির। তারপর ইন্দ্রাণী তাদের সামনে বসিয়ে খাওয়াতে শুরু করলেন। মুড়িঘণ্টটা গণপতিবাবুর অসামান্য লাগল—ইন্দ্রাণী বলছে 'আরেকটু দিই' বলেই পাতে—আর গণপতিবাবুও সাঁটিয়ে ফেলছেন। শেষকালে অশোক বললেন, শুধু ওটা খেলেই হবে? মাছের কালিয়া, দইমাছ, মাংসের কোর্মা—এসবের কী হবে? সবই হল এবং আস্তে আস্তে গণপতিবাবুর চোখের মণি স্থির হয়ে গেল এবং তিনি জ্ঞান হারালেন—বারান্দা থেকে উমাপ্রসাদবাবু উদ্বিগ্ন সুরে বললেন, ১৯১২-তে বাবা এই বাড়ি বানিয়েছেন আজ অবদি এখানে কোনও মৃত্যু ঘটেনি! অনেক শুশ্রূষার পরে গণপতিবাবুকে কিছুটা সুস্থ করে টাঙ্গায় চাপিয়ে দেওয়া হল বাড়ির উদ্দেশে। ইন্দ্রাণী ফুঁপিয়ে উঠলেন চোখে আঁচল দিয়ে—কিন্তু আমার পুডিংটা যে মুখে দিলেন না একটুও! কয়েকমাস বাদে কলকাতায় লেকে প্রাতঃভ্রমণ করতে গিয়ে ইন্দ্রাণী আর অশোকের সঙ্গে গণপতিবাবুর হঠাৎ দেখা—গণপতিবাবু না দেখার ভান করে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন—কিন্তু ইন্দ্রাণী ছাড়বেন কেন? তিনি পিছু পিছু ছুটলেন—কিন্তু আমার পুডিংটা? সেই যে গণপতিবাবু লেকে হাঁটা বন্ধ করলেন আর ইন্দ্রাণীকে তিনি ধরা দেননি! আমাদের নিয়মিত চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় খাইয়েও গণপতিবাবুকে সেই পুডিং খাওয়াতে না পারার শোক কিন্তু ইন্দ্রাণীর আজও ঘোচেনি।

তপনদার মুখে শোনা একটি ঘটনা দিয়ে শেষ করি। তিনি তখন বালক, তাঁর এক পিসির বিয়ে হচ্ছে কীর্তিপাশা গ্রামে। শোনা গেল এক বিরাট খাইয়ে আসছেন বরযাত্রীর সঙ্গে, একা একটা পাঁঠা খান। রাত করে বিয়ে, রাত করে খাওয়া। তিনি বসলেন, দুই আস্ত কলাপাতা নিয়ে। বালতি করে মাংস এল। তাঁর পাতে ঢালা হচ্ছে, আর পাশের পাতে হাড়ের স্তূপ জমে উঠেছে। সেটা বেশ সাইডপ্লেট। তাঁকে ঘিরে দর্শকের ভিড় তাঁকে বিচলিত করছে না। তপনদার এক পিসেমশাই তাঁর সঙ্গে রসিকতা করে বললেন, 'আপনে আর খাইলেন কী? কিসুই তো খাইলেন না। আর কী খাইবেন কন।' তিনি মুখ তুলে শান্ত গলায় বললেন, 'খাওয়াইবেন? বেশ। আরও একখান পাঁঠা আনেন।' এবারে মুশকিল হল। সবার খাওয়াদাওয়া হয়ে গিয়েছে, মাংস ফুরিয়ে গিয়েছে, আর পাঁঠা বাকি নেই বাড়িতে। কিন্তু বরযাত্রীর ডিমান্ড, ইজ্জৎ কা সওয়াল! কোথাও থেকে সংগ্রহ হল আরও একটা ছাগল। রান্নাও হল। তিনি গ্রামের লোকদের চমক লাগিয়ে আস্তে সুস্থে সত্যিই খেয়ে শেষ করলেন দ্বিতীয় পাঁঠা। তারপরে একটা কলসি থেকে মুখে ঢেলে কিছু জল পান করলেন। এরপরে দু'জন লোক তাঁকে দুই হাত ধরে টেনে তুলে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে সেই ছাগরূপী দানব বাতাপিকে হজম করে ফেলে বশিষ্ঠ মুনি যেমন বজ্রনির্ঘোষে স্বর্গমর্ত পাতাল প্রকম্পিত করে প্রবল এক বায়ু নিঃসরণ করেছিলেন, যাতে বাতাপির শেষ পরিসূচিত হল, ইনিও তেমনি এক তুমুল বায়ুধ্বনি পূর্বক তাঁর মহাভোজনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

পরের দিন সকালে তপনদারা আবিষ্কার করেছিলেন ওঁদের খেলার সাথী, ছোটকাকার আহ্লাদী পুষ্যি খাসি, যার আদরের নামটি ছিল রবিনসন, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

৩০.০১.২০১০

nabaneetadevsen@gmail.com

দ্বন্দ্বসমাস

সমরেশ বসু এবং কালকূট-এর মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। দুয়ে মিলে পূর্ণ হয় এক অপূর্ব বৃত্ত। হাত ধরাধরি করে এই আলো ওই আলো।

অনেক বছর আগে সমরেশ বসু যখন 'দেখি নাই ফিরে' লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, শান্তিনিকেতন ছুটছেন, বাঁকুড়ায় যাচ্ছেন রামকিঙ্করের খোঁজে, তখন মুখোমুখি বসে অভিভূত সৌভাগ্যবান এক তরুণ লেখক জিগ্যেস করেছিল, এ লেখা কি কালকূট-এর হবে?

মৃদু হেসে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। রাঢ়ের মাটির অতল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এক শিল্পীর সমস্ত জীবনের কথা লিখতে বসেছিলেন তিনি। একটু-একটু করে রামকিঙ্কর-কে অনুভব করছিলেন, সেই ছিল তাঁর বলতে গেলে শেষ যাত্রা, শেষ যাত্রাটি তো কালকূট-ই করেছিলেন সমরেশ বসু-র নামে, কেননা সেই উপন্যাস বলি, জীবনকাহিনি বলি, অথবা এইসব আভিধানিক সাহিত্যের বাইরের কিছু বলি, যেটুকু পড়তে পেরেছিলাম, অনুমান মিথ্যে হয়নি, ও-লেখা কালকূট-এরই হতে পারত।

এখন এত বছর বাদে তাঁকে যদি জিগ্যেস করি, তিনি কী বলবেন? সমরেশ মিশে গিয়েছে কালকূট-এ, কালকূট মিশে গিয়েছে সমরেশ-এ, তুমি আর কিছু জানতে চাও? আচ্ছা আমার 'পাপপুণ্য' গল্পটি কি কালকূট-এর হতে পারত? গলায় দড়ি দিয়ে মরা মেয়ের লাশ নিয়ে বাপ শ্মশানে যাচ্ছে। হ্যাঁ, রাঢ় দেশের মাটি পায়ের তলায়।

রাঢ়ের মাটি কি আপনাকে এমন করেছিল?

মৃদু হাসলেন তিনি, বললেন, কই, আমি কি রাঢ়ের মানুষ?

—তা হলে 'শানা বাউরির কথকতা', 'উত্তাপ', ওই 'পাপপুণ্য', আর কালকূট-এর 'কোথায় পাব তারে'?

সমরেশ বসু মৃদু হাসলেন, বললেন অন্য কথা।

না না, সমরেশ আর কালকূট এই দুই লেখক সম্পর্কে একটু কৌতূহল আছে আমার, আর সম্পাদক বলেছেন যে...। কথা থেমে যায় তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে।

তিনি হাসলেন, বললেন, আমার 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' মনে পড়ে?

—হ্যাঁ, কে মনে রাখেনি, এখনও কত জন প্রথম পাঠে বিস্মিত হচ্ছেন।

—আমার 'পাড়ি' গল্পটি, 'অকাল বসন্ত', 'উত্তরঙ্গ', 'বিটি রোডের ধারে'?

—হ্যাঁ, সমরেশদা, কিন্তু তা হলে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' কে লিখলেন?

সমরেশ বসু বললেন, হাঁটো, বেরিয়ে পড়ো মেলায়-মেলায়, পথে-পথে, তুমি টের পাবে কে আসলে লেখক।

—প্রকৃতি?

—শুধু তো প্রকৃতি নয়।

আমি বললাম, মানুষ?

—সে তো স্বাভাবিক উত্তর?

—তা হলে কার কথা বলছেন?

—আমিও তো জানি না কে লেখাল, কে আসল লেখক, তবে ওই যে যাত্রা শুরু হল তোমার, ঘর ছেড়ে পা রাখলে পথে, মেলার দিকে হাঁটছ, তোমার লেখা তোমার ভিতরে হয়ে উঠছে, তখন তুমি সমরেশ বা কালকূট—আমি জানি না কে কার আড়ালে আত্মগোপন করেছে।

অনেক বছর আগে এইরকম এক কল্পিত কথোপকথন হতে পারত। কিন্তু সমরেশ বসুর লেখায় আচ্ছন্ন, কালকূট-এর লেখায় বিভোর এক নবীন লিখিয়ে একটি কথাই সাহস করে জিগ্যেস করেছিল, লেখাটি কার হবে? সমরেশ বসু না কালকূট?

তিনি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। মৃদু হেসে, প্রশ্নটির মর্যাদা দিয়েও উত্তর দেননি। সেই উত্তর এখন খুঁজতে বসেছি একটু বদলে নিয়ে। কালকূট আর সমরেশে কোনও বিরোধ ছিল কী? বিরোধটা কী? কালকূট আর সমরেশ-কে মুখোমুখি বসিয়ে দিলে তাঁরা কীভাবে সাহিত্যের কথাটি বলবেন? দুই লেখকের তো দুই দর্শন, অন্তত সমালোচক বোদ্ধারা তো সেই কথাই বলেন। যে সমরেশ 'বিটি রোডের ধারে' লিখেছেন সেই সমরেশ যেন 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে' বা 'শাম্ব' লেখেননি। তাই কী? লেখক তো জীবনভর লিখতে-লিখতে নিজেকে বারবার ভাঙেন, গড়েন, তার ফলে যে সমরেশ 'বিটি রোডের ধারে' লেখেন, তিনিই তো 'বিবর' বা 'প্রজাপতি', 'পাতক' লেখেন। আবার ফিরেও আসেন 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'-র মতো আশ্চর্য উপন্যাসে। তাঁর প্রথম জীবনের উপলব্ধি, কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা উজাড় করে দেন।

প্রকৃত লেখক বারবার বদলাতে চান নিজেকে। যে পথে তাঁর সহজসিদ্ধি—তাকে পরিহার করে নতুন পথের খোঁজে বেরোন। এই-ই তো স্বাভাবিক। এ অভিজ্ঞতা তলস্তয়-পাঠেও যেমন সমরেশ-এও তেমন। তবে তার রূপটি আলাদা নিশ্চয়।

মানুষও বদলায়। লেখক কি বিশ্বাস বদল করেন না? আমার প্রিয় কবি আন্তরিকভাবে ধর্মীয় মৌলবাদে সমর্পণ করেছেন নিজেকে, এ অভিজ্ঞতা আমাদের নেই? আল-মাহমুদের কথা বললাম। কত মানুষকে বদলাতে দেখেছি। হ্যাঁ, সমস্ত জীবন আমি একইরকম থাকব—এ কী করে হয়? পৃথিবী বদলাচ্ছে, সমাজ বদলাচ্ছে, প্রকৃতি আমার শরীর ভাঙছে, সবই বদলে যাচ্ছে যখন মানুষের ভাবনার বদল হবে না কেন? জগদ্দল পাথরও শীত গ্রীষ্মে বর্ষায় একটু একটু করে ক্ষয় পায়।

কিন্তু এই বদল, আর সমরেশ বদলে কালকূট হয়ে যাওয়া, আবার সমরেশ-এ ফিরে যাওয়া, আবার কালকূট-এ...এই নিরন্তর যাত্রা তো আলাদা কথা মনে করায়। সমরেশ বসুর মতো বড় লেখকের কি চেনা দু'টি পথ ছিল? আলাদা পথ? আলাদা দর্শন? না হলে একই লেখকের দু'টি আলাদা সত্তা হয় কী করে?

আমার এখন মনে হচ্ছে একটিই পথ। যেতে-যেতে থামা। আবার এগিয়ে যাওয়া। আমার মনে হচ্ছে সমরেশ-কালকূটে পারস্পরিক আত্মগোপন হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে না একই লেখকের দু'টি আলাদা সত্তা। বরং একই সত্তার দু'টি আলাদা রূপ।

সাহিত্যের বড় জায়গাটি হল কীভাবে লেখক তাঁর কথা বলবেন। আঙ্গিক হল কথাসাহিত্যের খুব বড় জোরের জায়গা। সমরেশ বসু, কালকূট আলাদা হয়েছেন আঙ্গিকে।

বিষয়টিতে ঢুকতে হলে সমরেশের আরম্ভের কথা ভাবতে হয়। আমার তো মনে হয় সমরেশ বসু পেয়েছিলেন তারাশঙ্করের উত্তরাধিকার। তারাশঙ্কর যেখানে থেমেছেন, সমরেশের আরম্ভ সেখান থেকেই। তারাশঙ্করই আমাদের প্রথম জানালেন মাটির কথা, মাটি-মাখা মানুষের কথা। তাঁর লেখায় ইঙ্গিত ছিল মাটির



মায়া ভাঙছে, মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে, কলের দিকে যাত্রা করছে। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের বনোয়ারি রেললাইন ধরে হেঁটেছিল কলের ধোঁয়ার দিকে। সমরেশ বসুর গল্পে উপন্যাসে কলে কাজ করতে আসা বনোয়ারিরই আর এক চেহারা। যে ভূমিহীন হয়ে কলে কাজ করতে আসে, তারই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। 'পাড়ি' গল্পটির কথা মনে পড়ে কি আমাদের? আমাদের কল কারখানার সব শ্রমিকই তো ছিল ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া চাষি। উত্তরাধিকার এইভাবেই এসেছিল তারাশঙ্কর থেকে সমরেশে।

তারাশঙ্করের যে মাটির কথা বলেছিলেন তা ছিল রাঢ় দেশে। তাঁর রাঢ়ের মাটিই যেন ভারতবর্ষের রূপ ফুটিয়ে তুলেছিল। সমরেশের প্রথম দিকের গল্পে রাঢ়ের মাটি ছিল, তারাশঙ্করের ছায়া ছিল। তাঁর সেই সময়ের গল্প 'গুণিন' পড়লে তা বোঝা যায়। তারাশঙ্করের লেখায় যে রাঢ়ের উদাসী প্রকৃতির ছায়া ছিল সর্বত্র, সেই ছায়ায় ঢাকা ছিল গুণিন। আসলে বীরভূমের উদাসী প্রকৃতি সমরেশের লেখায় পরে সেভাবে না-এলেও, ওই প্রকৃতি থেকে তিনি তাঁর দেখার চোখ পেয়েছিলেন। বীরভূম সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণা এসেছিল তাঁর 'শানা বাউরির কথকতা'-য়, বীরভূম এসেছিল তাঁর 'পাপপুণ্য' গল্পে। সেই সব গল্পে সমরেশ নিজেই পেয়ে গিয়েছেন নিজের বলার কথা। এ দু'টি গল্পের ভিতরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় গৈরিক মাটি তাঁর ভিতরে প্রবেশ করেছে তার উদাসী প্রকৃতি নিয়ে। আর এই উদাসী প্রকৃতির রূপই অন্যভাবে এসে গিয়েছে কালকূট-এর ভ্রমণোপন্যাসে। এই সুর ছিল তারাশঙ্করেও অন্তর্লীন হয়ে। 'রাইকমল', 'রসকলি'র কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় মাঠের পর মাঠ, হাওয়া, লালধুলোর কথা। অন্তহীন মাঠ যেন শেষই হয় না...এই মাঠই, জনমানবে পূর্ণ মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবলোকনকারী লেখক সেখানে আলাদা হয়ে গিয়েছেন নিজে-নিজে। একা হয়ে দেখতে চাইছেন ভারতবর্ষকে।

সমরেশের লেখায় কল-কারখানা, বন্ধ কারখানার শ্রমিক, কমিউনিস্ট পার্টি, জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষ এসেছে—এসেই গিয়েছে। কঠোর সংগ্রামের পর জীবনের রসে সিক্ত মানুষের প্রকৃত রূপ তাঁর লেখায় ঘুরে-ঘুরে এসেছে ('পাড়ি' গল্পটির অন্তিম পঙ্‌ক্তিগুলোর কথা মনে করি)। এই জীবনরস-ই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। ফুরসত পেলে এই মানুষ ছোটে মেলায়, আনন্দ ও পুণ্য একইসঙ্গে অর্জন করতে।

সমরেশ বসু আর কালকূট-এ বিরোধটা কোথায়? তারাশঙ্কর যে মাটির কথা বলেছিলেন, মাটি হারানো চাষির কথা বলেছিলেন, সেই চাষিই হয়ে যায় সমরেশের অসংখ্য গল্প-উপন্যাসের চরিত্র। বিটি রোড, গঙ্গার ধারের চটকলের শ্রমিক, পাড়ি, অকালবৃষ্টি, অকাল বসন্ত—অসংখ্য গল্পের মূল চরিত্র। আর সমরেশ বসু যেখানে থামেন সেখানেই যেন কালকূট-এর আরম্ভ হয়।

আসলে সমরেশ বসু কোনওরকম বাঁধাধরা লিখনরীতিতে বিশ্বাস করতেন না। মানুষ চেনা, মানুষ দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। বীরভূম তো তাঁর দেশ ছিল না, কিন্তু 'গুণিন'-এ বীরভূম যেমন আসে, আসে অসামান্য দুই গল্প 'পাপপুণ্য' আর 'শানা বাউরির কথকতা'-য়। আসে আরও অনেক গল্পে। কেন আসে, না সেই গৈরিক প্রকৃতি তাঁকে টানত। তাঁকে দেখিয়েছিল সীমার মাঝে অসীমতার আসল রূপটি। এই রূপই ভারত নামে দেশটির। তাই যখন নিতান্ত কৌতূহলে, ভারতবর্ষকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় তিনি মহাকুম্ভে হাজির হন, তিনি যেন দেখেছিলেন বীরভূমের গ্রামের ধারে বসা ছোট্ট এক মেলা বাড়তে বাড়তে কুম্ভমেলার রূপ ধারণ করেছে। যে-লোকটি সমস্ত বছর প্রবল যুদ্ধ করেছে বেঁচে থাকার জন্য, সে ফুরসত পেয়ে পা বাড়িয়েছে কুম্ভের দিকে। এ যেন 'পাড়ি' গল্পের সেই পুরুষ ও রমণী, ভাদ্রের দু'কূল ছাপানো গঙ্গায় শুয়োর পার করতে গিয়ে মরতে মরতে বেঁচে-ফেরা মানুষ দু'টি কাজ শেষের পর অন্নগ্রহণ করে জীবনের উত্তাপ নেয় পরস্পরে। তারপরও তো জীবন থেমে থাকে না, তারাই তো যাবে মেলায় তীর্থে। কালকূট না হলে সমরেশ যেন পরিপূর্ণ হতেন না। একজন লেখক শুধু তো লেখার জন্য লেখেন না, যে-পথে চলেছেন তিনি সেই পথ যেন অন্ধ গলি না-হয়ে যায়। তার জন্য নতুন-নতুন পথ খুঁজে বের করাই তাঁর ধর্ম। সমরেশের মনে হয়েছিল নিশ্চয়, জীবন কোথাও থেমে থাকে না। জীবন কখনও ফুরোয় না, তা চলতেই থাকে, পরিপূর্ণ হয়ে যেতেই থাকে। তাই বোষ্টম বৈরাগীর মতো তাঁর পথে নামা। বাউল, বোষ্টম, বৈরাগীরা রাঢ় দেশের অন্তহীন মাঠ যেভাবে পার হয়ে যেতেই থাকে, যেভাবে 'ডাকঘর' নাটকে রাজার চিঠি নিয়ে রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের ওপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে...কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে...সেইভাবেই জীবন চলতেই থাকে। 'ডাকঘর' নাটক পড়লে আমার মনে পড়ে যায় রাঢ়ের প্রান্তরের কথা। মনে পড়ে যায় বেড়ো পাহাড়ের কোলে বসা মেলার কথা (পুরুলিয়া), আর তা বেড়ে-বেড়েই তো হয়ে গিয়েছে কুম্ভমেলা। রবীন্দ্রনাথ তো রাঢ়ের মাটিতেই আজীবন কাটিয়েছেন। সমরেশ রাঢ়ভূমিতে বসবাস না করলেও উদাসী বাউল বোষ্টমের মতো চিনেছিলেন এই প্রকৃতি আর তার সংলগ্ন মানুষ। মহাকুম্ভে যাওয়া সেই কারণে। গিয়ে নিজের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করার অভিলাষ বুঝি সার্থক হল। এরপরই কালকূট-এর ভারতবর্ষ-যাত্রা শুরু হল—'কোথায় পাব তারে' রচিত হল। রচিত হল পরপর অসম্ভব সব উপন্যাস। হ্যাঁ উপন্যাসই বলব, এর লিখনপ্রক্রিয়া, এর আঙ্গিক আলাদা।

কালকূট আর সমরেশ-এ কোনও বিরোধ আছে বলে আমার মনে হয় না। মনে হয়েছে সমরেশের 'উত্তরঙ্গ', 'বিটি রোডের ধারে', 'জগদ্দল' এইসব উপন্যাস না-লেখা হলে 'পাড়ি', 'পাপপুণ্য', 'শানা বাউরির কথকতা', 'অকাল বসন্ত' না লেখা হলে কালকূট ভারতবর্ষ-যাত্রা করতে পারতেন না।

কল-কারখানার যে শ্রমিক তারা তো ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে আসা মানুষই। তার ভিতরে যেমন বীরভূমের কোপাই নদীর কূল থেকে আসা বনোয়ারি আছে, ফুলবেড়ের চটকলের দিকে যাত্রা করা গফুর মিঞা (মহেশ—শরৎচন্দ্র) আছে, তেমনি আছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, ওড়িশা থেকে আসা মানুষ। বিটি রোডের ধারের কারখানায়, গঙ্গার তীরের চটকলে সমরেশ এদেরই তো দেখেছেন জীবনের আরম্ভে, বর্ণময় লেখক-জীবনের শুরুতে। এরাই তাঁকে কুম্ভমেলায় টেনেছিল হয়তো। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'-র ভিতরে আছে ভারত দেশটির মানুষের প্রাণময় বর্ণনা :

'পথের দু'ধারে চলেছে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, গুজরাট, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ। কী বিচিত্র তার রূপ! কোথাও রঙিন পায়জামা, পাঞ্জাবি ও ওড়নার সঙ্গে ঘাড়ের ওপর এলানো খোঁপা, দোলানো বেণী। বাঁকা খোপায় ফুল গুঁজে রঙিন রেশমি শাড়িতে টেনে দিয়েছে কাছা। গলায় ঝোলানো বেল্টের সঙ্গে খাপে ঢাকা ছুরি, কোমরে তলোয়ার নিয়ে চলেছে পাঞ্জাবি শিখ। হাজার কুচি-ঘেরা ঘাগরায় ঢেউ তুলে চলেছে দিল্লিওয়ালি, বিচিত্র বর্ণবহুল চৌদ্দো হাত শাড়িতেও সর্বাঙ্গ উদাস করে চলেছে রাজপুতানী। মাথায় সোনার টিকুলি, হাতে পায়ে সোনা। কারুর বা রূপোর হাঁসুলি, কান-ছিঁড়ে পড়া ছ-ইঞ্চি ভারি কর্ণাভরণ। নাকের দু'পাশে নাকছাবি, কপালে দেশি গোপালি রঙের সিঁদুর টিপ, সামনে কুঁচি দিয়ে বাঁদিকে আঁচল এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ দেশিনী। বাবরিকানী লুঙ্গি পরা, মুখে চুরুট পুরুষ বাহিনী। কোথাও চোস্ত পায়জামা আর চুড়িদার পাঞ্জাবি, কোথাও নকশা ফোটানো নাগরা জুতো, ধুতি আর ঝোলা পাঞ্জাবি পরা গোঁফ পাকানো হিন্দুস্তানের পুরুষ। এরই মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে কস্তা পেড়ে বাংলা শাড়ি আর বাংলা সিঁদুরের আগুনের মতো লাল উজ্জ্বল টিপ ও শাঁখা। সর্বহারা শুভ্রবেশিনী বিধবা। কদাচিৎ বাঙালি কুমারীর মস্ত বড় আঁটখোপা, স্নিগ্ধ মুখে উত্তরপ্রদেশের ধূলি রুক্ষতা। আর কোঁচা



দোলানো কিংবা পায়ের গোড়ালি অবধি মালকোচা দেওয়া পুরুষ, আমারই মতো সব টাইপ চেহারার বাঙালি (অমৃতকুম্ভের সন্ধানে—পৃঃ ৩১, বেঙ্গল পাবলিশার্স)।

এই ভারতবর্ষকে চিনতে গিয়ে তিনি শানা বাউরি-কে চিনেছেন, বিটি রোডের ধারের কলকারখানার মানুষ চিনেছেন। সমরেশ বসু রাজনীতি জানতেন, রাজনীতির উর্ধ্বে মানবধর্মকে বিশ্বাস করতেন। সমরেশের নানা উপন্যাসে সেই মানবধর্মেরই তো বিপুল বিস্তার। এই বিস্তার যখন আরও প্রসারিত হতে থাকল সব দিকে, তখন তাঁকে অন্য আঙ্গিকের কথা ভাবতে হয়েছিল। অন্যভাবে লেখার কথাও ভাবতে হয়েছিল। কালকূট-কে সৃজন করলেন সমরেশ। আমাদের ভাষায় নতুন ধারা এল। এ পথে তারাশঙ্কর যাননি, তার উত্তরাধিকারী সমরেশ যেতে পেরেছেন। এ-সুর তারাশঙ্করে ছিল, সমরেশ সেই সুর ধরে নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তারাশঙ্কর এই পথে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেননি।

আমি বকবক করেই যাচ্ছি। সমরেশ বসু হাত তুললেন, থামো। আমি সব ভুল বললাম?

—তোমার মতো করে তুমি ভেবেছ, আর কেউ তো আর একভাবে ভাবতে পারে, কোনওটাই শেষ সত্য নয়, চিরকালের মতো অভ্রান্ত নয়।

আমি মাথা নোয়ালাম।

সমরেশ বসু বললেন, পরের প্রজন্ম কিছু সুবিধে পেয়ে যায় পূর্বসূরীর কাছ থেকে, তারাশঙ্কর তো তাঁর আরম্ভে 'কবি' পড়েননি, তারাশঙ্করের রাঢ় দেশের প্রকৃতিকে তারাশঙ্করের সৃষ্টির ভিতর দিয়ে চেনেননি।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। আমরা তো তাঁর প্রায় তিন প্রজন্মের পরের লেখক। আমরা কি পেরেছি কালকূট-এর ধারাটিকে আর এক আঙ্গিকে পুষ্ট করতে? কী করে হবে? উদাসী ভারতবর্ষের মাঠ প্রান্তর ঘূর্ণি বাতাসের পিছু পিছু হেঁটে যাওয়া মানুষ আর দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা না-চিনলে, অনুভবে না-জানলে, কী করে সেই ধারা পুষ্ট হবে?

কালকূট ▲ সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ইশারায় কইবি কথা

তাঁর লেখার মধ্যে বাজে বৈরাগীর লাউ। জীবন বয়ে যায় কলকলিয়ে। সে ভারি অভিরাম।

'কার আজ্ঞায়, কে বা রাখে নাম। নাম, কালকূট। অর্থ যার তীব্র বিষ।'

এইরকমই স্বঘোষণা সেই কালকূট-এর। অথবা একজন লেখক মানুষের, যিনি এই ছদ্মনামের আড়ালবর্তী থাকতেই ভালবাসেন। এই আড়ালের নেপথ্যে এক বিচিত্র জীবনের আখ্যানপর্ব। সেখানে অনটন, দারিদ্র্যাদি উতরোল। জীবনের পাকে-পাকে যৌবন বিশীর্ণ হতে-হতে আবারও মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা। একেই বুঝি সংগ্রাম বলে। কিন্তু হায়, 'সংগ্রাম' কথাটি তথাকথিত রাজনীতির পাকে-পাকে আজ পচে যেতে বসেছে। প্রতিদিন এই বাংলায় সাধারণ মানুষ মরছে কীটের মতো। রাজনীতির লেনাদেনা ঘটছে একটি লাশকে কেন্দ্র করে। যে আগে দখল করতে পারে তারই সম্পত্তি এই মৃতধনটি। কার ছেলে, কার স্বামী এ-সব সত্য রাজনীতির সংসারে অচল।

কালকূট-প্রসঙ্গে এই রাজনীতির কথা। কেননা তাঁর কথায়, 'যে শিশু ফুটপাথের ওপর না খেতে পেয়ে মরে পড়ে থাকে, রাজনীতির নামাবলি ওর শবের গায়ে দেখি। ও কি রাজনীতি করত?'

সেই ১৯৫২ সালের কথা। দেশে ভোট লেগেছে। কালকূট পার্টি-কর্মী। বারাকপুর শিল্পাঞ্চলময় তাঁর কাজ। এই সময়েই তাঁর বাবা গত হলেন। শ্রাদ্ধকর্ম শেষে মুণ্ডিত মস্তকের টঙে একগুছি শিখা-সমেত তিনি পথে নেমেছেন। চলেছেন বাসে চড়ে। হঠাৎ রাস্তা আগলে কংগ্রেসের জোড়া বলদের এক মারমুখী মিছিল। যেহেতু বাঙালি এলাকায় একটি মিছিলের ওপর আক্রমণ হয়েছে, এখন তার বদলা এই অবাঙালি এলাকায়। বাস থামিয়ে দিয়ে আরম্ভ হল বেধড়ক মার। যারা মারছে তাদের মুখে মদের গন্ধ। এমনকী তারা অওরতদেরও বে-ইজ্জত করছে। এ অবস্থায় একজন লাঠিধারী তাঁকে বাস থেকে টেনে নামায়। লাঠি হানবার আগে তাঁর দিকে চেয়ে কিঞ্চিৎ থমকে গেল। কালকূট বলে উঠলেন, 'ক্যা হুয়া?'

নিপাট ধুতি-পাঞ্জাবি আর ন্যাড়া মস্তকে উজ্জ্বল টিকির সঙ্গে ওই 'ক্যা হুয়া' বচন বাঁচিয়ে দিল। লাঠিধারী তাঁকে বাঙালি অঞ্চলে না-যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আর এক ব্যক্তির ওপর ঝম্প দিল। 'সেই ঘটনাই তখন লিখেছিলাম, ছদ্মনামের আড়াল নিয়ে। স্বয়ং জওহরলালকেও উদ্দেশ্য করে বলতে হয়েছিল, এইসব কুনাট্যরঙ্গের নেপথ্যে তাঁর ছবিও দেখা যাচ্ছে।...লেখাটি ছাপা হয়েছিল একটি কমিউনিস্ট (অখণ্ড) মতবাদী পত্রিকায়। কালকূটের উদ্ভব সেই প্রথম রাজনৈতিক রচনায়, আর সেই শেষ। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।'

এর পরে-পরেই কালকূট-এর মুক্তি ঘটেছিল 'পার্টি নামে একটা বদ্ধ জলা' থেকে। আরও কি আশ্চর্য স্বীকার যে সে-সময় তাঁর ভেতর দেশপ্রেম জাতীয় গুরুতর শব্দটির কোনও অনুভূতি ছিল না! এমনকী স্বাদেশিকতার বোধটিও অস্পষ্ট। যদিও 'রাজনীতির প্রথম দীক্ষাটা কমিউনিস্ট পার্টিতেই ঘটেছিল।'

সেই ১৯৫২ সময়ের কালকূটকে আমি দেখিনি। দেখার কথাও নয়। কেননা তখন আমার সদ্য-শৈশব। তার অনেক বছর পরে নৈহাটিতে আমার বাবার মাসিমার বাড়িতে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম। বাবার মাসিমা—নির্মলশশী দেবী তাঁর বইয়ের আলমারি খুলে একখানি বই আমায় দেখিয়েছিলেন। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে।' উৎসর্গের পাতায় সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, 'মাসিমা, ছদ্মনামের আড়াল থেকেই আমার প্রণাম নিন—সমরেশ।' এই সমরেশই তা হলে কালকূট?

সেই বিয়েবাড়ির দেদার বারান্দায় হঠাৎ সেই অতিথি বা অতিথি নয়, একেবারেই ঘরের লোক কালকূট-কে আমার প্রথম দেখা। বেঁটেখাটো, চেহারা রোগা রোগা, একমাথা কোঁকড়া চুলের নীচে ভারি লাবণ্য-ছোঁচা মুখের সাজ, একজোড়া বিভোল চোখ। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। মনে আছে পরিষ্কার, পরনে বাড়িতে কাচা একটি সস্তা সিল্কের পাঞ্জাবি। আর অতি সাধারণ, বাড়িতেই ধোয়া ধুতির কোঁচাটি বেশ যত্ন করে পকেটে গোঁজা। আর হাতে তুলে ধরা একথোকা মস্ত হলুদ-রঙা গাঁদা ফুল। বুঝি এইটিই তাঁর সেদিনের নেমন্তন্নবাড়ির উপহার। কী আশ্চর্য



সাধারণ, কিন্তু অভিনব এই মানুষ! বিয়েবাড়ির সানাই, হুলস্থুল মানুষজনের ভিড়ে মুখের হাসিটি ভাসিয়ে যথাতথা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রান্নাঘরে থরে-থরে খাবার সাজানো। ঝুড়ি থেকে একটি চপ তুলে নিয়ে কামড় দিচ্ছেন। তাঁর চকচকে ওষ্ঠে চপের তেল চপচপ করছে। ক্ষুধার বিমূর্ততা পাশ কাটিয়ে। ঝকঝক করছে চোখজোড়াও। আশ্চর্য!

সেদিন আমায় কাউকে বলে দিতে হয়নি কে এই নতুন মানুষটি। এত সব মানুষের মধ্যে এই মানুষটির ঘুরে বেড়ানো, তাঁর দারিদ্র্যের শোভন হাসি আর অচেনা উদাস এক স্বভাব তাঁকে আর পাঁচজন থেকে আলাদা করে রেখেছিল। বুঝতে পারিনি, এই কি তাঁর ছদ্মবেশ? না কি মানুষটিই ছদ্ম!

এত কিছু বোঝাবুঝির টান-রপটানি পেরিয়ে এই প্রথম চোখের আওতায় একজন জ্যান্ত লেখককে দেখেছিলাম। তাঁর লেখা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি। সেই স্কুলবালক আমার চোখের ভেতরে একে-একে জীবনরহস্যের দিকবিদিক খুলে যাচ্ছিল পরতে-পরতে। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম বাইরের বিপুল সংসারের ডাক—যেখানে একতারা বাজছে আর গান হচ্ছে 'যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কীসের লেনাদেনা।' যারা এই গান গায়, তারা নিভৃতস্বরে রটনা করে যায় মানুষের মধ্যে মানুষকে খুঁজে ফেরার ইতিকথা। ধরি ধরি করেও এ-তত্ত্ব আমার কাছে অধরাই থেকে যায়। অথচ মনে-মনে ঘুরপাক খায় 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাসে যত্নে লিখে রাখা সেই মা-খেগো নুলো বলরামের নির্বিকার কথা, 'বাবু পা দুইখানা নাই, কিন্তু মানুষ তো। তাই মানুষ ছাড়া থাইকতে পারি না।

কালকূট যে মানুষ ছাড়া থাকতে পারেন না এ-কথা ক্রমে ক্রমে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে বৈরাগীর লাউ বাজলেও জীবনযাপনে ভারি কেতা! নৈহাটির বাড়িতে প্রতি শনিবার আসেন কলকাতার নিবাস থেকে। কলকাতায় লেখার সংসারে ইতিমধ্যেই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী, বাস্তবে শ্যালিকা, রয়েছেন। নৈহাটির ঘরে প্রথমা—গৌরী দেবী, সবার বড়দি।

দ্বিতীয়া সম্পর্কে তাঁর কথা খুবই সিধেসাপটা। সেই অমৃতকুম্ভের কালে এ বিষয়ে তাঁর ইশারা। তখনও এ সংসার হয়নি। নৈহাটিরই এক ভিনপাড়ায় কালকূট-এর শ্বশুরবাড়ি। বিদগ্ধ শ্বশুর মুখুজ্যেমশাই। তখন উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহের কিস্তি পড়ে তিনি জামাতা বাবাজীবনকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। যেমন, 'ওহে এইমাত্র তোমার এবারের ক্রমশটা পড়লুম। শ্যামা মেয়েটির জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।'

এই শ্যামা মেয়ে বিহারের ভুঁইহার ঘরের আশি-বছুরি বৃদ্ধের তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী। মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্তি করে বসলেন, 'তোমার প্রতি মেয়েটির যেরকম টান দেখছি তাতে তুমি তাকে চুমো খেলেও কোনও অন্যায় হত না।'

'কথাটা বলেই বোধহয় তাঁর খেয়াল হল, তাঁর কন্যা (মদীয় পত্নী) সামনেই দাঁড়িয়ে। ফল যা হওয়ার তাই হলো, তাঁর কন্যা গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কোণে দাঁড়ানো কনিষ্ঠতমা কন্যাটি ফিক করে হেসে লাফ দিয়ে বাগানে চলে গেল। দ্বাদশবর্ষীয়া শ্যালিকাটির চোখের তারায় কবে যে বিদ্যুতের সঞ্চার হয়েছে, তাই ভেবেই অবাক হলাম।'



তবে ওই শ্যালিকাটির সঙ্গে দ্বিতীয়া ঘরনির সম্পর্ক পাতানোয় সংসার-সমাজে অবাক ঘটেছিল। হরেক কলকথা আর নিন্দা-চর্চায় সমাজে অজস্র ছি ছি পড়েছিল। এ নিয়ে কালকূটের সদাহাস্য মুখে কোনও মেঘ কি উঠেছিল? তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়ার কথা আমার নয়। কেননা এই কালকূট-এর সঙ্গে আমার প্রচণ্ড বাবার কিঞ্চিৎ বন্ধুতা ছিল। সে-সম্পর্ক অবশ্যই পানের সভায়। অনেক মধ্যরাতে দু'জনারই শ্রীচরণে অনেকবার চাঞ্চল্য ঘটেছে। ফলে লেখক যশোপ্রার্থী এই কথকের সঙ্গে কালকূটের সাহিত্যালোচনা দূরের কথা, দু-চার সামান্য কথার পরেই, তোমার বাবার খবর কী বলো? এই দূরত্ব মিটতে বহু সময় লেগেছে। তিনি যখন প্রথম প্রথম আমল দিতেন না আমিও মনে মনে কম কেটা।

কালকূট নিজের নামের অর্থ তীব্র বিষ করলেও পণ্ডিত হরিচরণ তো প্রাথমিকভাবে আরও এক মানে করেছেন—কালের অবসাদক বা দাহক। অতঃপর এই কাল কথাটি নিয়ে পণ্ডিত মহাশয় প্রায় দেড় পৃষ্ঠা জুড়ে বিবিধ মানের অবতারণা করেছেন। আমাদের কালকূট কেন যে তীব্র বিষের দিকে ধাবিত হলেন, সে নিয়ে এখন প্রশ্ন করার অর্থ না-থাকলেও অনর্থ কিছু থাকে বৈকি।

এ-সব প্রশ্ন একেবারেই ব্যক্তিগত স্তরে ঘোরে-ফেরে। মনে মনে ভুপকিতে তাল পড়ে। গান হয়,

'বিজোড়ে নাই, জোড়ে রসিক
রসের আস্বাদ করে
রাধা বিনে কৃষ্ণ নাই
অধরা ধরে।'

তবে কি না যতই এত কথা বা গান বলি কালকূট নামে লেখকটির সাহিত্য বিষয়ে কারবারে-বসতে মন নেই আমার। যেহেতু তিনি আমার পিতৃবান্ধব এবং এই মানুষটিকে বিস্তর কাছ হতে দেখার সুযোগ আমার ঘটেছে, তাই মানুষ কালকূট নিয়ে দু-চার কথা বলতেই স্বস্তি। সেই মোতাবেক একদিন নৈহাটির বিখ্যাত পাকিস্তান বাজারে, নবমী পুজোর সকালে, তাঁর ধোপদুরস্ত সাজ—গিলে-করা ধবধবে পাঞ্জাবির পাশপকেটে আমার সদ্যলেখা একখানি তথাকথিত কড়চার পাণ্ডুলিপি গুঁজে দিয়েছিলাম। আমার সেই কলেজে-পড়া বয়েসে এ কাজ করতে মনে কোনও সংকোচ হয়নি। দিয়ে বলি, লেখাটা যদি পড়ে বলেন...।

মতামত বলেছিলেন। তবে বিস্তর তলব, তাগাদাদির পর—এক সকালে ওই নৈহাটি বাজারের আড় ভেঙে অজিতদার ঘুপচি আড্ডার দোকানে যেতে যেতে। অনেক এ-কথা সে-কথার পর তাঁর মন্তব্য, যখন লিখবে—লেখার ভেতরে বসে লিখবে। দ্বিতীয় কথা, লেখার সময় তাড়াহুড়ো করবে না। একটু থিতিয়ে লিখবে। আর তিন নম্বর উপদেশ হল, লেখার সময় কাউকে আন্ডারএস্টিমেট করবে না। কাউকে, মানে পাঠককে।

এই তিন উপদেশের বিষয়ে আমার তখনকার কী নিষ্পত্তি ছিল সে-কথা মনে নেই এখন। তবে এখনও মাঝে-মাঝে তাঁর গাঢ় কণ্ঠস্বর মনে-মনে শুনতে পাই বইকি। তবে ওই লেখার ভেতরে বসে লেখার কথাটি কেবলই ফসকে-ফসকে বেরিয়ে যায়।

কালকূট পড়তে বসে এবং তাঁকে চোখের আওতায় দেখতে দেখতে মনে মনে ভারী প্রশ্ন-সংকট হয়। আমি বুঝতে পারি না তাঁর কোনও এক বইয়ের প্রচ্ছদে 'নারী ত্রৈলোক্যদায়িনী' কথাটি আঁকা রইলেও সেই ত্রিভুবনের রূপ কোন খাতে বয়। সনাতন বাউল তত্ত্বে বারংবার রূপের কথা ওঠে পড়ে। সেই সহজিয়াদের ক্ষীণ বুকের ভেতরে রূপ দেখা না-দেখার উতরোল ঢেউ ওঠে পড়ে। ঢেউয়ের ঘূর্ণি পাক খায়। এই রূপ এমন এক অধরা বস্তু যা পেয়েও হারাই স্বভাবে আপনাকে আপনি না-চেনার রূপটানি বইয়ে চলে আজীবন, আমরণ। এই চূড়ান্ত অসহজ কথাটির মুখোশ কেন যে সহজের ছাঁদে গড়া সে-কথাও আমার মতো আনকার কাছে অচেনাই থেকে যায়। এর নাম-রূপই কি অধরচাঁদ?

কালকূট-এ এমনই কিছু বা আরও ভিন্ন কিছু তন্ত্রের নামা-ওঠার ভিয়ান আছে। কিন্তু পাঠকের খাতায় সে সকল মারণ-উচাটনের ধার ঘেঁষে কিঞ্চিৎ খিটকেলই বটে। তবে যেখানে জীবন বয়ে যাওয়ার কথা কলকলিয়ে আঁকা হয়—সে ভারি অভিরাম। তবে সেখানেও একটি কথা ওঠে। লেখক যেখানেই যান না কেন, সে মেলাপ্রান্তর বা দিল্লির বনেদি এলাকাই হোক না কেন, সবখানেই এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হয়।

অতএব এই কিন্তুর প্রশ্নটি ঝুলেই থাকে। সামান্য ব্যতিক্রম 'শাম্ব'।

ভারতের পুরাণ থেকে আহরণ করা কাহিনি-নিচয় ভরসা করে এই কালকূট-কে লিখতে হয়েছে 'প্রাচেতস্', 'পৃথা', 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি', 'শাম্ব'—ইত্যাদি। লিখতে হয়েছে অবশ্যই পূজা ও বিশেষ সংখ্যার তাড়নায়। কিন্তু তার মধ্যে বুঝি 'শাম্ব'-কে আলাদা করে রাখতে হয়। এই শাম্ব অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাসী মানুষ যে তার নিজের বিশ্বাসের খনিটি আর পাঁচ রুগ্‌ণ মানুষের কাছে মেলে দেয়। তার নিজের শাপমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও সব পীড়িত, হতাশ মানুষের মুক্তির পথ বার করে নেয়। এ এক বিচিত্র সমবেত বিশ্বাস আর আস্থার আন্দোলন। এমনকী পুরাণে যা নেই তাও তিনি খনন করে তুলে এনেছেন এই উপন্যাসে। বাজারে রটিত বহুজীর্ণ সংগ্রাম কথাটি এখানে বড় সুঠাম ছন্দে নৃত্য করে।

কালকূট যখন পুরাণ ভাঙছেন সে-সময়ে নৈহাটির মফস্বল মানসিকতায় এক বিচিত্র কটাক্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম কারণ তাঁর দু'টি সংসার। দু'টিই জাত ব্রাহ্মণ মুখোপাধ্যায় পরিবারে। দ্বিতীয় বিষয়, তথাকথিত পাস করা বিদ্যে না-রইলেও তিনি প্রাণপাত সংস্কৃত-চর্চা করছেন। আর হুটহাট চলে যাচ্ছেন ভাটপাড়ায় পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের কাছে—পুরাণের জটিল রহস্য বুঝতে। সাহিত্যের জন্যে এমন প্রাণপাত শ্রম আজও এক আশ্চর্য ঘটনা। ঠিক তখনই তাঁর নাম করে বাজারে রুচিহীন মজা উড়ছে, কায়েতের বেটাটা শেষকালে বামুন হয়ে গেল!

সেই দারুণ গরমের প্রাক-সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। নৈহাটির বাড়ির দোতলায় বসে তিনি লিখছেন। নীচের ঘরে বড়দি—তাঁর প্রথমা স্ত্রী হারমোনিয়াম বাজিয়ে রিনরিনে কিন্নরী স্বরে গান গাইছেন—রাতের আতরে ভিজাইয়া আদরে, কেন বঁধু দূরে যাও...। আমি শুনছি শচীনকর্তার এই গানখানি কী অবাক সুন্দর ওই নারীকণ্ঠে!

ঠিক এমনি সময়ে লোডশেডিং। একটু পরে লেখক তাঁর দোতলার ঘর থেকে নীচের বারান্দায় নেমে এলেন। খালি গা। পরনে পাজামা। আর উশকো-খুশকো মাথা।

আমার দিকে একবার তাকালেন। তারপর কীরকম আনমনা আর বিচ্ছিন্ন স্বরে বলে উঠলেন, আমি ঘর থেকে বারান্দার দিকে গেলাম, তন্মুহূর্তে আলো চলে গেল।

চমকে ওঠারই কথা। এই ভাষায় সাধারণত কথা বলা হয় না। আসলে তখন 'শাম্ব' লেখা চলছিল।

কালকূট-এর পুষ্ট ঠোঁটের ওপর তলায় আড়াআড়ি গভীর কাটা দাগটি বুঝি তাঁর হাসির সাজ। ওই দাগটির কারণেই হয়তো তাঁর মুখ সদাই হাসি-হাসি। এখন সেইরকম মুখ নিয়েই তিনি বলে যাচ্ছেন, 'বাউল বলো বৈষ্ণব বলো, সকলই মানব-মানবী লীলা। এই আলো-আঁধারি উঠোনে সকলের ছায়ায় হারিয়ে আমি একলা একলা তাই-ই দেখি।'

অতঃপর কালকূট গান ধরেছেন,

'ইশারায় কইবি কথা,
দেখিস যেন কেউ না শোনে।
কিছুদিন মনে মনে—
ও রাই, রাই লো!...

কালকূট ▲ উদিত বসু

বাবা সম্পর্কে দু'টো কথা

হয়তো আরও বহু কথা লেখা যেত। কিংবা যেত না। কাছের মানুষের সব কথা গুছিয়ে মনে পড়ে না কি!

আমার জীবনে আমার বাবা-র সশরীরে উপস্থিতির সময়সীমা কুড়ি বছর। সঠিকভাবে হিসেব করে বললে—উনিশ বছর, এগারো মাস, বারো দিন। আমি তখন ক্লাস টুয়েলভ-এর ছাত্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উত্তর শিক্ষা সদন'-এর। দু'বছর আগে শান্তিনিকেতন 'পাঠভবন' বিদ্যালয় থেকে ক্লাস টেন-এর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে, স্কুলেরই দশজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা (অধ্যক্ষ, শ্রদ্ধেয় সুপ্রিয় ঠাকুর শ্রদ্ধেয়া শুভ্রা ঠাকুর ও শ্রদ্ধেয় অরূপ মিত্র) ইংল্যান্ডে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করতে গিয়েছিলেন, ওখানকার 'টেগোর সোসাইটি'-র অন্যতম প্রাণপুরুষ, শ্রদ্ধেয়, প্রয়াত তপন গুপ্ত মহাশয়ের আমন্ত্রণে। আমিও সেই দশজনের মধ্যে একজন ছিলাম এবং জীবনের অন্যতম সেরা ঘটনাবলির মধ্যে তা বিরাজ করবে। সেটা অন্য ঘটনা এবং অন্য প্রসঙ্গ—যা এখন, এখানে, আলোচনার দরকার নেই। বাবাকে নিয়ে লেখার বিষয়ে এই লন্ডন প্রসঙ্গ টেনে আনার কারণ একটাই এবং সেটা বিদেশ যাওয়ার ঠিক আগে।

ইংল্যান্ড রওনা হওয়ার আগের দিন, সন্ধ্যাবেলা, শান্তিনিকেতন থেকে আমাদের পুরো দলটাই কলকাতায় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অতিথিশালায় এসে উঠেছিলাম। কে, কোন জায়গাটা এবং খাটটা নেব, সেই কর্মব্যস্ততার মধ্যেই, হঠাৎ একজন এসে আমাকে সুপ্রিয়দার সঙ্গে দেখা করতে বলেন এবং সেটা তাড়াতাড়ি। উৎকণ্ঠিত অবস্থায় দৌড়ে সুপ্রিয়দার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি—বাবা হাসি হাসি মুখে সুপ্রিয়দার সঙ্গে কথা বলছেন। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গমগমে স্বরে সুপ্রিয়দা জানালেন—'শোনো হে শ্রীমান—তুমি এখন তোমার বাবার সঙ্গে একঘণ্টার জন্য বেরুবার অনুমতি পেলে, জরুরি একটি ব্যাপারের জন্য। একঘণ্টার মধ্যে সমরেশবাবু তোমাকে আবার ফেরত দিয়ে যাবেন। তাই যাও—ঘুরে এসো।'

বাবা, সুপ্রিয়দা এবং শুভ্রাদি সোফা থেকে উঠে পড়লেন। বাবা সুপ্রিয়দা শুভ্রাদি-কে আমার ফিরে আসার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে, আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম—কিন্তু অন্যান্য সময়ের মতন বাবা গাড়ির সামনের বাঁদিকের আসনে না-বসে, আমার সঙ্গে পিছনের সিটেই উঠে বসলেন। একটু অবাকই হলাম। বাবা ব্যাপারটা আমার তাকানোর মধ্যেই বুঝে, একটা হাসি দিয়ে, আমার কাঁধে হাত রেখে, সুরিন্দরদাকে (আমাদের গাড়ির চালক) পার্ক স্ট্রিটের 'ওখানে' যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করলে, বাবা খুব শান্তভাবে আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে জানালেন যে আমরা এখন পার্ক স্ট্রিট-এ 'পার্ক নার্সিং হোম'-এ যাচ্ছি, মা-র সঙ্গে দেখা করতে। আরও জানালেন, চিন্তা করার বা ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই—হঠাৎই মা-র শরীরটা গত পরশুদিন থেকে খারাপ হয়ে পড়ে। পারিবারিক ডাক্তারকাকু (ড. বারীন ঘোষ) মা-কে পরীক্ষা করেই বাবাকে নির্দেশ দেন মা-কে নার্সিং হোমে জরুরি ভিত্তিতে ভর্তি করাতে। তিন-চারদিন ওখানে থেকে সবকিছু ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে নেওয়ার জন্য। সেইজন্যই মা-কে ওখানে রাখা হয়েছে এবং যেহেতু আমি বেশ কিছুদিনের জন্য দূরে থাকব, তাই মা-র সঙ্গে আগে দেখা করতে যাচ্ছি। খবরটা আগে না-জানানোর কারণ একটাই, যাতে বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমার মনঃসংযোগের ব্যাঘাত না-ঘটে। তা ছাড়া দু'দিন বাদেই যখন আমি কলকাতায় আসব, তখনই একেবারে জানা ও দেখা হয়ে যাবে। কথাগুলো বলতে বলতে বাবা কিন্তু বারেবারে আমার কাঁধে ও পিঠে হাতের মৃদু চাপড় দিয়ে যাচ্ছেন আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য। কিন্তু বাবা নিজেও যে



পারিবারিক অ্যালবাম থেকে

মা-র শরীর খারাপ নিয়ে দুর্ভাবনায় রয়েছেন, সেটা আমি খুব ভাল করে অনুভব করতে পারছিলাম। কীভাবে, কোন ঘটনায় বা কথায় আমি অনুভব করছিলাম, তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কিন্তু করেছিলাম।

নার্সিং হোমে পৌঁছেও বাবা আমার কাঁধ থেকে হাত না সরিয়ে, সোজা এলিভেটর-এর ভিতরে আমাকে নিয়ে ঢুকে এলেন। সেকেন্ড ফ্লোরে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে, আমরা সোজা গিয়ে মা-র কেবিনে ঢুকলাম। চোখে, মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি থাকলেও মা হেসে আমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য জিগ্যেস করলেন—'কী? ভয় পেয়ে গিয়েছিস তো? রাগও হয়েছে নিশ্চয়ই বাবার ওপর? কিন্তু আমিই বাবাকে খবর দিতে না করেছিলাম, তা ছাড়া তোর তো এক-দু'দিনের মধ্যে আসার কথাই ছিল—সেই জন্যই...।' তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'কী গো, তুমি ওকে বলোনি?'

বাবা স্মিত হাসি বজায় রেখে বললেন—'হ্যাঁ, আমি ওকে সবই বলেছি। চিন্তা করারও কিছু নেই, সব ঠিকই আছে। কিন্তু ওর চোখ-মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছিলাম, তোমাকে নিজের চোখে না-দেখা পর্যন্ত ও শান্ত হতে পারছে না। তাই, তুমি ওকে বাড়ি আগে নিয়ে গিয়ে, খাওয়াদাওয়া করিয়ে, এখানে নিয়ে আসার কথা বললেও, আমি আগেই ওকে এখানে নিয়ে এলাম। ও দেখল, কথা বলল তোমার সঙ্গে, এবার বাড়ি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে, খাওয়াদাওয়া করে নেবে। সুপ্রিয়বাবুকে আমি সব বলেই ওকে নিয়ে এসেছি, আবার আমিই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসব। ওকে পৌঁছে দিয়ে, একবার 'লেক ক্লাব' যাব, 'বুধসন্ধ্যা'-র মিটিং আছে। অবশ্য আমি ওদের বাবিনের আসার ও লন্ডন যাওয়ার ব্যাপারটা বলেছি—তোমার সঙ্গে দেখা করানোর ব্যাপারেও ওদের বলে রেখেছি। সুতরাং, দেরি হলেও সমস্যার কিছু নেই।'

এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা—'কী? ঠিক আছে? নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছে তো? এবার চলো—বাড়িতে গিয়ে তুমি একটু খাওয়াদাওয়া করে নেবে। তারপর তোমাকে সুপ্রিয়বাবুর জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব! দেরি হলে আবার ওঁরা চিন্তা করবেন। তোমাদের কাউকেই তো বাড়ি



যাওয়ার পারমিশন দেওয়া হয়নি। একমাত্র তোমাকেই স্পেশাল পারমিশন দেওয়া হয়েছে—তোমার মা-র অসুস্থতার খবর শুনে। তোমাদের গ্রুপেরই কারুর গার্জেন হবেন মনে হল—তিনি তো সাজেস্ট করছিলেন, তোমাকে এখনই মা-র খবর দিলে, তুমি আপসেট হয়ে পড়লে মুশকিল। একদম বাইরে থেকে ঘুরে আসার পরই তোমাকে সব জানানো উচিত। এ সমস্ত কথায় আমি আবার একটু কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু, সুপ্রিয়বাবুর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তা নাকচ করে দিয়ে, তোমাকে নিয়ে আসার পক্ষেই মতামত জানান খুব দৃঢ়ভাবে।'

মা বলে উঠলেন—'নিজে মা তো, তাই সেটা অনুভব করেই কথাটা বলেছেন।' আমার খারাপ লাগছিল, রাগও হচ্ছিল। একটা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা, আর লন্ডনের মতন একটা দেশে যাওয়ার উত্তেজনা আর আনন্দটা হঠাৎ করেই কেমন যেন জল ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল।

মা হাত বাড়িয়ে আমার বাজুটা ধরে বললেন—'মন খারাপ করার মতন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নেই তো এখন। গণ্ডগোল কুম্ভমেলা থেকেই শুরু হয়েছিল। ভেবেছিলাম, এখানে ফিরে এসে রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাব। স্ট্রেন একটু হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমার শরীরের থেকে তোমার বাবা-র শরীর নিয়েই আমি বেশি চিন্তিত ছিলাম। অতখানি হয়রানি, দৌড়োদৌড়ি—আমার তো বেশ দুশ্চিন্তাই হচ্ছিল, ভয়ও পাচ্ছিলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সে তখন, এই মানুষের অন্য চেহারা। সঙ্গে আবার সুমন (সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়) চেলা জুটেছিল। সে তো আর এক খেপা! আলাদা করে সাঁকো নাড়া দিতেও লাগে না। খবর পেলেই হল—চললেন 'দাদা' আর 'ভাই'—রাত নেই, দিন নেই, দুপুর নেই...আর সত্যিই বটে, একেই বলে কুম্ভমেলা—পূর্ণ কুম্ভ। ঘটনা আর চরিত্রের কোনও কমতি নেই। কাকে ছেড়ে কাকে দেখব—ঘটনার ঘনঘটা।' সিস্টার ঘরে ঢুকলেন—হাসিমুখেই। বাবার দিকে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই বাবা বলে উঠলেন—'আমাদের দেখা করার, কথা বলার সময় তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তোমার জন্যই এখানেও আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামিকাল সকালবেলার ভিজিটিং আওয়ার্স-এও ইচ্ছে করলে তোমাকে নিয়ে আসা যেত, কিন্তু কাল সকালবেলা তোমরা সকলেই দুপুরের ফ্লাইট ধরার জন্য ব্যস্ত থাকবে, আর তখন তোমাকে নিয়ে আমি যদি নার্সিং হোম যাব বলি, তা হলে ওঁদের ওপর প্রেসার ক্রিয়েট করা হবে। আবার যদি ট্রাফিক জ্যাম বা কোনও গণ্ডগোলের জন্য লেট হয়, তা হলে ওঁরা কীরকম টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবেন—সেই সব ভেবেই তোমাকে সন্ধেতেই মা-র সঙ্গে দেখা করানোর ব্যাপারটা ঠিক করি।'—আমরা ইতিমধ্যে কথা বলতে-বলতেই, মা-র কাছে বিদায় নিয়ে, নীচে গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম।

বাড়িতে স্নান করে, পেট পুরে খাওয়াদাওয়া করে রেডি হয়ে বাবাকে জানাতেই, বাবা যাওয়ার জন্য উঠে পড়লেন। বাবা এই সময়টা পুরোটাই অপেক্ষা করেছেন। আমি নিজেই 'গ্রন্থন বিভাগ'-এ চলে যেতে পারব বা হেঁটেই এক্ষুনি পৌঁছে যেতে অসুবিধে হবে না, তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই ইত্যাদি কোনও কথাই বাবাকে অন্যরকম কাজ করাতে সক্ষম হল না। বাবার একটাই বক্তব্য—'আমি সুপ্রিয়বাবুকে বলে এসেছি, আমিই আবার তোমাকে নিজে পৌঁছে দেব। সুতরাং, তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে পারব না। তুমি একলা নিজে নিজে যেতে যে পারবে, সেটা আমি জানি। তবু সুপ্রিয়বাবুর সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে, আমি তা রাখতে যাচ্ছি।'

কোনও দরকারি কিছু ভুলে যাচ্ছি কি না সেসব ভাল করে চেক করে নিতে, আর শরীরের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা সাধারণত বাবা কোনওদিনই বলেন না। এগুলো মা-রই কথা। আজ ঘটনাচক্রে সব উল্টে গিয়েছে। বিরল অভিজ্ঞতা। লন্ডন গিয়ে ঠান্ডা লাগিয়ে শরীর খারাপ না-করার মতন কথা, বাবা অন্তত এতদিন বলেননি। বাবার সাধারণত বক্তব্য হয়—'সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো। যে কাজই করো, মনঃসংযোগটা খুবই জরুরি। লেখাপড়া কিন্তু সব থেকে জরুরি—সেটা অবশ্যই মাথায় রাখবে।'—ইত্যাদি ধরনের। এই প্রথমবার বাবা, মা-র ধরনের কথাগুলোর বললেন। এমনকী চামড়ার জ্যাকেট—যেটা কলকাতায় এসে আমার সংগ্রহ করার কথা ছিল বাড়ি থেকে—সেটা বাবা একটা পলিথিনের প্যাকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে, নিজে হাতে করে আমায় দিয়ে বললেন—'এটা তোমার লাগেজে ঢুকিয়ে নিও, গিয়েই—বাইরে ফেলে রেখো না, ভুলে যাবে। অবশ্য হ্যান্ডব্যাগেও ঢুকিয়ে নিতে পারো, হিথরো-তেই কাজে লাগবে। দেখো সেটা, তোমার যা সুবিধে হবে, কোরো। আর ওর ভেতরেই, তলার দিকে, দু-সেট উলেন মোজাও দেওয়া আছে। তোমার মা খুব সম্ভবত ওগুলো দিল্লিতে কিনেছিলেন—আমাকে তো ওখানেই পরতে হয়েছিল। তখনই তোমার জন্যও কেনা হয়েছে।'

এই সমস্ত কিছুর পর বাবা আমাকে সুপ্রিয়দা, শুভ্রাদির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শুধু, একটা ছোট্ট কথা গাড়িতে আসতে আসতে বলেছিলেন আমার মাথার পিছনের দিকের চুল মুঠো করে ধরে—'আমি তোমার এই নিজগুণে বিদেশযাত্রার ঘটনায় অত্যন্ত খুশি হয়েছি—আমায় তুই গর্বিত করেছিস।' বাবাকে জড়িয়ে ধরে আদর খেয়ে ও আদর করে সে-দিন যে আমি অমৃতের স্বাদ অনুভব করেছিলাম, আজ তা বুঝতে পারি।

আর একটা ঘটনার কথাও খুব জানাতে ইচ্ছে করছে। সেটা সম্পূর্ণ অন্য এক সমস্যায়, দ্বিধাগ্রস্ত বাবা ও সাহিত্যিকের দ্বন্দ্বের ব্যাপার।

'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাস তখন পাক্ষিক এক জনপ্রিয় পত্রিকায় পাঠক-মহলে বেশ আগ্রহের সঞ্চার করেছে এবং করছে। এতদিনে অনেকেই জানেন—উপন্যাসটি শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ-এর জীবনের ওপরেই লেখা হচ্ছিল। শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের শিল্প, জীবন এবং দিনযাপন সম্বন্ধে যাঁরা অবগত ছিলেন বা আছেন, তাঁরা জানেন তিনি কীরকমের বিতর্কিত একটি চরিত্র। তাঁর ছোট থেকে বড় হওয়া, শিল্পের প্রতি আকর্ষণ, পারিবারিক-নাপিতের কাজ করতে অসম্মত হওয়া, শান্তিনিকেতনে গুরুদেব এবং নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে কলাভবনে শিল্পশিক্ষা নেওয়া, ক্রমশ বড় হতে থাকা, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একজন শিল্পী হয়ে ওঠার যে সমস্ত বাস্তব ঘটনা ঘটেছিল, সব কিছুই এই 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসে, বাবার লেখার ব্যাপার ছিল। কিছু-কিছু ঘটনার ব্যাপারে কিঙ্করদার আশেপাশের অনেকেই জড়িয়ে ছিলেন। যাঁরা, বিভিন্ন সময় কিঙ্করদাকে মানসিক ও দৈহিক সবদিক থেকেই আঘাত করেছেন, সুযোগ নিয়েছেন তাঁর সরলতার বা অপ্রকৃতিস্থ পরিস্থিতির। এখন, এইসব ব্যাপার বা ঘটনা যখন উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বা সত্যিটা জানাজানি হয়ে যাবে, তখন তাঁদের অবস্থান, অভিব্যক্তি বা ব্যবহার সাহিত্যিকের প্রতি কেমন হতে পারে বা হবে, সেটা নিয়ে আমার বাবা চিন্তিত ছিলেন না। বাবার মূল চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল একটাই—বুলবুল, ডাকু এবং বাবিন। অর্থাৎ—আমার বড়দি—বুলবুল বসু, আমার ভাগ্নে এবং বড়দির ছেলে—অর্জুন (আমরা সমবয়সি) এবং আমি। কারণ, আমরা তিনজনই তখন শান্তিনিকেতনে থাকি।

আমি আর ডাকু ছাত্র, বড়দি গানের শিক্ষয়িত্রী। বাবার উপন্যাসের সেই সব ক্ষমতাশালী ব্যক্তি 'প্রতিদান'-স্বরূপ, যদি আমার, বড়দি-র বা ডাকু-র কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করেন বা ক্ষতি করেন, সেক্ষেত্রে বাবা-দাদু হিসেবে কী করা উচিত। অসম্ভব মানসিক একটা দ্বন্দ্বে, অস্থির অবস্থায়, বাবা একদিনের জন্য আমাদের তিনজনকেই, সময়-সুযোগ করে, কলকাতায় আসার অনুরোধ করেন। অবশ্যই আমাদের পড়াশোনার এবং বড়দির কাজের ব্যাঘাত না-ঘটিয়ে। দু-তিন দিনের মধ্যে আমরা তিনজন কলকাতায় বাড়ি এলে সারাদিনের কাজকর্ম শেষ করে, বাবা বাড়ি ফিরে, জামাকাপড় পাল্টে, বাড়ির জামা, পাজামা পরে, হালকা



মেজাজে, আমাদের কাছে সব খুলে বললেন এবং আমাদের মতামত চাইলেন। সঙ্গে এ-ও জানালেন যে, সাহিত্যের প্রতি ওঁর দায়বদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, বাবা এবং দাদু-র দায়িত্বও তিনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছেন না এবং চাইছেনও না। আমাদের তিনজনের ব্যক্তিগত মতামত তাই বাবার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই মতামত যেন স্পষ্ট আমাদের মনের কথাই হয়। কোনও কিছুতেই প্রভাবিত বা কুণ্ঠিত হয়ে, আমরা যেন মতামত ব্যক্ত না-করি, সেটা বাবা বারেবারেই, বিভিন্ন বাক্যে, ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে, আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করে গেলেন।

আমাদের তিনজনের মতামত জানাতে, খুব বেশিক্ষণ সময় আমরা নিইনি। ভিন্নমতও আমাদের ছিল না এ-বিষয়ে। সেরকম কোনও পরিস্থিতির যদি সত্যিই সৃষ্টি হয়, তা হলে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শক্তির অভাববোধ করিনি আমরা।

আরও বয়স হওয়ার পর, যখন, বাবার সশরীরে অনুপস্থিতির অভাব ব্যথার কারণ হয়ে উঠছে, তখন একদিন হঠাৎ-ই অনুভব করলাম যে আমার শরীরে সেই ভদ্রলোকের রক্তেরই প্রবাহ আছে, যিনি আতপুরের ভাঙা টালির ঘরে বসে 'আদাব' গল্প সৃষ্টি করতে পারেন, শুধু লিখেই জীবিকার্জন করতে পারেন এবং স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটি-র তথাকথিত শিক্ষা লাভ না-করেও বাংলা সাহিত্যজগতে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাই, যে কোনওরকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শক্তির অভাববোধ অন্তত কখনও করব না।

কালকূটের চোখে সমরেশ বসু

একটি অসম্পূর্ণ নিবন্ধ, প্রায় আত্মজীবনী, স্মৃতির টুকরো কোলাজ।

মেঘ যায় গলতে, ঝর ঝর ঝরতে। আমি যাই সুধার সন্ধানে। তীব্র বিষ নাম আমার—কালকূট। গরল আমার ধমনীতে। সেই কবিতার মতো বলতে ইচ্ছা করে, 'চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন/ব্যথীর বেদন বুঝিতে পারে?/কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে/কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?' আমার দৌড় ঝাঁপ ছুটো ছুটি যাই বল, সেই কারণে। মরি যে! জ্বলি যে! তাই আমি ভ্রমি সুধার সন্ধানে। বাঁচতে কে না চায়? মানুষ তো বহুত দূর, ওটা জীবের ধর্ম। হতে পারি কালকূট। তা বলে অমৃতের সন্ধানে যাব না? এই আকণ্ঠ বিষ নিয়ে বাঁচব কেমন করে?

...

মনে করার চেষ্টা করি, ওকে কি আমি তিনি? দেখেছি কি কখনো? মানুষটার চোখের দিকে তাকাই। মুখের দিকে দেখি। দেখি পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত। না, এ বড় বেকায়দার ব্যাপার। ডানদিক দিয়ে দেখতে গেলে একরকম, আর বাঁয়ে গেলে আরেক রকম। এক চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় চিনি চিনি। আর এক চোখের দিকে তাকিয়ে ধন্দ লেগে যায়। মনে হয় উহুঁ, একে আমি চিনি না। অথচ দেখেশুনে মনে হচ্ছে, মানুষটাকে দেখেছি সেই যেন জন্ম থেকে। এখন যখন আমাকে পুছ করা হচ্ছে, দ্যাখ তো তোমার বিষকূট চোখে, কেমন লাগে? চেনো কি না?

...

এমনটা না তো, ওকে জন্মকাল থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি বলেই, মনে হচ্ছে, দেখে এসেছি, আর সেই জন্যই চেনা চেনা লাগছে, আবার অচেনা লাগছেও? এক-একবার সেই পুরনো দিনের গানটা মনে পড়ে যায়, 'বহু দিনের চেনা বলে মনে হতেছে। তুমি কে পাগলিনী হে।' তবে এক্ষেত্রে পাগলিনী না, পাগল। হ্যাঁ, এই একটা কথা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, ওকে তোমার কালকূট চোখে কেমন দ্যাখ? পাগল দেখি, তবে সেয়ানা পাগল কিনা, সেটা আবার এক ধন্দ।

...

এখন ওর বাড়ি ফিরে যাবার সময়। যে বন্ধুদের সঙ্গে ও পার্কে খেলা করেছে তারা ঘরে ফিরে গিয়েছে। ওর পকেটে ছিল পঞ্চম জর্জের ছাপাওয়ালা ঝকঝকে একটা তামার পয়সা। পুরো একটি পয়সার বাদাম কম না। প্যান্টের পকেট বোঝাই করে, তাই চিবিয়ে চলেছে। ঘরে ফেরার গা নেই। ফিরতে দেরি হলে যে কী পেড়ার হবে, তাও যেন মনে নেই। তারপরে ওর দৃষ্টি গেল সেই ছেলে-গুলোর দিকে, যারা লোকের জল শুষে নেওয়া ডাবের খোলায় আঙুল ঢুকিয়ে, নেয়াপাতি খুঁটিয়ে খাচ্ছে। ব্যাপারীদের কাছে, হাত বাড়িয়ে কলা চাইছে। একটা কলা দ্যান। ওর চকচকিয়ে ওঠা দৃষ্টি তারপরে গেল ভিখিরি ছেলের দিকে। হাত বাড়িয়ে বলে, বাবু একটা পয়সা দ্যান। বাবু, একটা আধ পয়সা দ্যান। ও বাদাম চিবোতে ভুলে গেল। কেন? এমন দৃশ্য ও কি জীবনে দেখে নি? রোজই তো দেখে থাকে। এমন দেখছে যেন, আর কখনো দেখে নি। ওর চোখ দুটি জ্বলজ্বলিয়ে উঠলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল রাস্তার ওপরে, পশ্চিমে সদর ঘাটের মোড়ে, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াল। ওর মনের রাজ্যে একটা কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয়। টেপা ঠোঁট, শক্ত মুখ আর জ্বলজ্বলে দৃষ্টি দেখেই তা বোঝা যায়। সকলের মুখের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন সে কারোকে খুঁজছে। তার-পরেই, কী অবাক কাণ্ড দ্যাখো, এক মাঝবয়সী ভদ্রলোকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, বাবু একটা পয়সা দ্যান।

ভদ্রলোক অন্যমনস্ক চোখ ফিরিয়ে তাকান, একটু যেন অবাক চোখেই, কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখেন। তারপরে জামার পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে, ওর হাতে দিয়ে চলে যান। ও পয়সাটা দেখল। ভদ্রলোককে দেখল পেছন থেকে। মুখ ফিরিয়ে, আবার অন্য লোকের মুখের দিকে তাকাল। এখন ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন একটা যুদ্ধে নেমে পড়েছে। এখন আর পিছনে যাবার প্রশ্ন নেই। নতুন ভিখিরি ছেলেটা এগিয়ে চলল। হাত বাড়িয়ে সকলকে এক কথা বাবু একটা পয়সা দ্যান।

কেউ দেয়, কেউ দেয় না। তবে ভিক্ষাদাতাদের সকলের চোখেই পলকের জন্য একটু জিজ্ঞাসা জাগে, একটু বা বিস্ময়। ও নিজেও জানে না, হাতের মুঠোয় কত পয়সা জমে উঠেছে। এখন বিচারের বয়ান কী, বল। এমন বালকের না সাবা-লোকের, এই মনের গুণের বিধান কে দেবে? ওর জীবনের পটভূমি ঝটিতি একেবারে পাল্টে গেল? ও তো দেখল না, ওর দিকে তাকিয়ে থাকা সংসারের চোখ বিস্ময়ে ভরা। ও কি বাড়ির কথা ভুলে গিয়েছে? পরিবার মা বাবা দিদি দাদা, সর্বোপরি এই শহর, যে শহরের ছেলে ও, সব যেন ছিঁড়ে ফেলে, ছুঁড়ে দিয়ে একেবারে ভিন পথে ছুট দিয়েছে।

ওর নতুন পথের যাত্রা ওকে সদর ঘাটের কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছে, খেয়াল নেই। মোতিমহল বায়স্কোপের ঘর ছাড়িয়ে, ভিড়ের মধ্যে হাত পেতে ঘুরছে, বাবু একটা পয়সা দ্যান।

...

এই বয়সে পৌঁছে, এখনো মাঝে মাঝে অবাক মানি, কেন ও সেই দশ বছর বয়সে এমন কাণ্ডটা করেছিল! জবাব একটা পাই, সেটা আবার মন-গড়া কি না, তাই বা কে জানে।

বন্ধুদের সঙ্গে খেলা শেষে, পকেটে বাদাম পুরে, বুড়ি গঙ্গার বুকে উদাস চোখে তাকিয়ে বাদাম চিবোচ্ছিল, তারপরে ওর নজর কেড়ে নিয়েছিল দুর্দশাগ্রস্ত হত-ভাগ্যের দল, যারা ওরই বয়সী। নজরের পরেই মন। তারপরে কি উথলে উঠেছিল ওর মনে? এটা জানি, ওর পয়সার তখনই কোনো দরকার ছিল না। সে-কথা ওর মনেও আসেনি। তবে? রাগ? ঘৃণা? যন্ত্রণা? ওরা যদি ভিক্ষে করে, তবে চল, তুইও ভিক্ষে করবি। কে তুই ভদ্রলোকের ছেলে, চার বেলা পেট পুরে খাস, খেলে বেড়াস, হাত পাতলে মায়ের আঁচল থেকে পয়সা বেরোয়। যা ভিক্ষে কর।

এ-ই কী সত্যি? তবে, ও যে ক্রুদ্ধ, তা বুঝেছি। ওর বুকে দাহ, এ কথা মনে হচ্ছে। মন যে কেবল টাটায়, তা তো না, জটা খুললেই দক্ষ-যজ্ঞ। ও তো কালকূট না, বিষ নিয়ে, বিষে জরজর। রাগে আর ঘৃণায়, কখনো কখনো ও ক্ষ্যাপা। দশ বছর বয়সের ছেলেটার মধ্যে, সেই প্রতিক্রিয়াটাই যেন দেখেছিলাম। ...

ওকে আমি নির্ঘাত চিনি, সে কথা কখনো বলতে পারব না। চিনি বলাও ভুল, কথা হয়েছে দেখাব। আমার চোখে দেখা। তবে সেই যে দেখেছিলাম, দশ বছর বয়সে, রাগের ক্ষ্যাপা হাত পেতে ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছিল, সেই রাগটা ওকে ছেড়ে যায়নি কখনো। দেখি, এখনো রেগে যায়, আর রাগলে, এমন কাণ্ড করে,





সেই ভিক্ষে করার মতোই, চমকে দেওয়া অবাক কাণ্ডের মতো। তখন লাগে লাঠালাঠি। আগে ছিলেন বাবা, মা, দাদা, দিদি, এখন রয়েছেন সমাজের দশজন। তাঁরা গণ্যিমান্যি লোক, তাঁদের কত দায়-দায়িত্ব। তুমি রেগে গিয়ে, যা খুশি তাই করবে, সে-অনাচার তাঁরা মানতে পারেন না। তখন তুমি নিজের মনে যা খুশি তাই করতে, লোকের কিছু আসত যেত না। ধাক্কা যা লাগবার তোমার পরিবারে গিয়ে লাগত। মাথা ব্যথা পরিবারের, বাপ-মায়ের। তাঁরা ঘরের মধ্যে শাসন করতেন। দশজনের কিছু আসত যেত না। তখন তাঁরা তোমাকে পই-পই করে বলেছেন। 'যা, ভাল করে পড়গা ইস্কুলে, নইলে দুঃখ পাবি শেষকালে।'

দেখছি, সেইটাই ওর ধারাতে বহে গিয়েছে। তাঁরা ওকে যে-ইস্কুলে যে-পাঠ নিতে বলেছিলেন, সে-ইস্কুলে সে-পাঠ ও নেয়নি। ওর মায়ের বিশ্বাস ছিল এরকম; তাই বলতেন, অষ্টম গর্ভের ছেলে স্বাভাবিক হয় না। তা ওর মায়ের কথার মধ্যে কিছু কিঞ্চিৎ সত্যি আছে বলে মনে হয়। তা না হলে, দশের সঙ্গে থেকে, দশের সঙ্গে এক রা-য়ে কেন বাজে না? দশে তো তাই চায়। আমরা এক চাকের মৌমাছি, আমরা ঐক্যবদ্ধ। কথায় বলে, সব শেয়ালের এক রা। তুমি ভিন্ রা দিতে গেলে চলবে কেন?

তখনই গোলমাল লেগে যায়। হৈ-হল্লা রাগারাগি চিৎকার হবেই তো। আমার পুরো সায় আছে। তখন তুমি ছিলে অবাধ্য ইউরা ছাওয়াল। এখন তোমার পরিচয়, বাংলার যারে কয়, লেখক। কথাটার পুরোপুরি মানেও আমি জানি না। যারা বই লেখে, তাদের লেখক বলে। তাই তো? ও বই লেখে। তার জন্যই ওর নাম সমরেশ। আমি যতদূর জানি, ওর বংশ দত্ত নাম ওটা না। শুনেছিলাম ওর নাম সুরথনাথ। সমরেশ কবে থেকে হল, আমার নিজেরও তেমন স্মরণে নেই। বোধহয় বই লেখবার আগে থেকেই, নিজের এই নামটা ও প্রচার করেছিল। সম্ভবত যখন থেকে হাতে লিখে ম্যাগাজিন বার করত।

হ্যাঁ, পাকামি ছিল ষোল আনা। সে কথা বলতে গেলে একটি পাকায়ন লিখতে হয়। আমার দেখাটা সেইরকম। সেই কী পাকামি বলে, তাই। এমন পাকামি তোমরা কত দেখেছ। পাকামি করতে গিয়ে আর দশটা ছেলের মতো, কোনোদিন ইস্কুলে যায়নি। সেই ঢাকা শহরের লক্ষ্মী বাজারে, গিরিশ মাস্টারের পাঠশালা থেকে বেরিয়েছিল। আর কোনোদিন নিয়মমাফিক বিদ্যালয়ের সীমানায় পাঠানো যায়নি। ওর ভগ্নিপতি ছিলেন ঢাকার গ্রাজুয়েট, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সেখানে জোর করে কিছুদিন পাঠানো হয়েছিল। পাঠালে কী হবে, ইস্কুলে যাবার জন্য সঙ্গে তো পাহারাদার পাঠানো যায় না। মা খাইয়ে-দাইয়ে, ছেলেকে পাঠাবেন ইস্কুলে। ছেলে বই বগলদাবা করে হাঁটা দিল কোন্‌দিকে? না, শ্মশানের দিকে।

হ্যাঁ, শ্মশানের দিকে। শহরের অন্য কোথাও যায় সেটা বোঝা যায়। দশ রকম দেখে শুনে বেড়াচ্ছে। চক বাজারে যেতে পারে, বাবুর বাজারে যেতে পারে। শহরে ঘুরে দেখবার অনেক কিছু থাকে। তা না, খুদে ওস্তাদ যেতেন শ্মশানে। সেই ফরিদাবাদ পেরিয়ে, বুড়িগঙ্গার ধারে শ্মশানে। যেখানে মানুষের শেষগতি, চিতারোহণ, দাহ, শেষে বুড়িগঙ্গার জলে সিঞ্চন, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি। এখানে ওখানে ছেঁড়া কানি, হোগলা পাটি, চাটাই ছড়ানো। গণ্ডা গণ্ডা কুকুর। দুই চরে সাধু। তার মাঝখানে ও গালে হাত দিয়ে বসে কী দেখত? কী শুনত? কী ভাবত?

জানি না। পাকামি দেখলে গা জ্বলে যায়। একে কি ছিন্ন-বাঁধা বালক বলে নাকি? সবাই যখন ক্লাসে বসে গুরুর কাছে শিক্ষা নিচ্ছে, দুপুরে টিফিনের সময় খেলে বেড়াচ্ছে, ও তখন শ্মশানের গাছতলায়, গালে হাত দিয়ে বসে। লেখা-পড়া রইল শিকেয় তোলা। ...

...

ও আবার সাহিত্যিক। কেন যে মরতে সাহিত্যিক হতে গিয়েছিল, জানি না।

বেশ তো ছিল ছোটবেলায়। বাঁশি বাজাতো, ছবি আঁকতো, সমাজের সঙ্গে সম্পর্কটা তেমন সরাসরি ছিল না। আমি তো এখনো মনে মনে প্রার্থনা করি, ও কলম ছেড়ে, তুলি ধরুক। লেখনী ছেড়ে বাজাক বাঁশি। কথা না লিখে, গলা খুলে গান করুক। তাহলে পাপ পুণ্যের জন্য আর এত মাথা কুটতে হয় না, রাগী লেখকের মতো কলমকে ছুরি করতে হয় না।

যাই হোক, ঘটনাটাই বলি। সমালোচক বলতে এ ক্ষেত্রে আমি ভদ্রলোককে উপকারী আখ্যাই দিতে চায়। উপকার তিনি করবেনই এ রকম একটি প্রতিজ্ঞা তাঁর আছে, অতএব, তিনি কারোকে ছেড়েই কথা বলেন না। সমরেশকে তিনি বলি দেবেন, এ আর আশ্চর্য্য কী। এক সময় ভদ্রলোক ছিলেন ওর বিশেষ গুণগ্রাহী। ওর থেকে উনি বয়োঃজ্যেষ্ঠও বটে। অনেক লেখকই তাঁর বন্ধু, সকলেই চান, তিনি যেন দু'কলম প্রশংসা করেন। তা সে ভালো কথা। কিন্তু উনি একদা অপরাহ্ণে, ওর কাছে নির্ভৃতে একটি ঘটনা বলেছিলেন। ওর বাড়ীতে ছিল একটি যুবতী দাসী, হয়তো কিঞ্চিৎ রূপসীও। ও কোনোদিন দেখেনি। ওর এক প্রতিবেশী লেখক ছিলেন, যাঁকে উনি খুবই প্রশংসা ও সমাদর করতেন। নিভৃত কাহিনীটি হলো এই, সেই প্রতিবেশী লেখক, ওঁর দাসীটিকে নিজের বাড়ির কাজে লাগিয়েছেন। ওঁর ভাষাটা ছিল, 'ঝি ভাগিয়ে নিয়ে গেছে।' কী লোভ দেখিয়ে প্রতিবেশী লেখক সেই দাসীকে নিজের গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা ও জানে না। বশীকরণের মন্ত্রটা টাকা না প্রেম, তা উনি বলেননি। পরিণতি হয়েছিল, ভদ্র-লোকের সঙ্গে সেই প্রতিবেশী লেখকের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং ওঁর মন্তব্য ছিল, 'লেখক না, একটা চরিত্রহীন লম্পট। ছোটলোকটা তা নইলে ভদ্র-লোকের ঝি ভাগিয়ে নিয়ে যায়?'

আমি ওর—মানে, সমরেশের মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর হাসি যেমন পেয়েছিল, ব্যাপারটাকে তেমনি করুণ মনে হয়েছিল। দাসী প্রেমটা ওর কাছে তেমন একটা মারাত্মক বলে মনে হয়নি। কিন্তু যে লেখকের দ্বারা কাণ্ডটা ঘটেছিল, সেই লেখককে ও দাদা বলে ডাকতো, এখনো ডাকে, মনে মনে একটু অবাক আর ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারেনি।

তারপরে অনেকদিন চলে গেছে। একটা যুগ বলা যায়। পরিবর্তন সর্বত্র সাহিত্য আর সাহিত্যিকরাও তার থেকে বাদ যায় না। ইতিমধ্যে সেই উপকারী ভদ্রলোক, সমরেশের ওপর খড়গহস্ত হয়ে উঠেছেন। বক্তৃতা করে, লিখে, সমরেশের মুণ্ডুপাত করছেন। সেটা এমন একটা কিছু ব্যাপার না। মজার ব্যাপারটা ঘটেছিল অন্যরকম। এক সাহিত্য সভাতে, উপকারী ভদ্রলোক, সমরেশ উপস্থিত, উপস্থিত সেই লেখকও যিনি ভদ্রলোকের দাসী গ্রাস করেছিলেন। দেখা গেল, মঞ্চের ওপর দুজনে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছেন। সমরেশ অচ্ছুৎ। তারপর ভদ্রলোক বলতে উঠে বললেন, 'ইনি হলেন প্রকৃত শিল্পী ও স্রষ্টা, (দাসী প্রেমিক) যাকে বলে যাত-সাহিত্যিক, আর এই যে সমরেশ, সাহিত্যের নামে কদর্য নোংরামি করছে'...ইত্যাদি। সমরেশের মুখ দেখে আমার মনে হল, ও বোধহয় ভ্যাক করে কেঁদে ফেলবে।

কিন্তু না, ও কাঁদেনি বরং ঘৃণায় আর রাগে ওর মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, বলতে উঠে বললো, 'মাছিদের যাই দেওয়া যাক, তারা খুঁজে খুঁজে চিটেগুড়ের সন্ধান করবেই।'...নবীনের দল খুশি হয়ে হাততালি দিল। কিন্তু তাতে ওর জ্বালা জুড়লো না। দেখলাম, বন্ধ ঘরে ও রাগে ছটফট করছে, অশান্ত ওর প্রাণ।

...

আমি দূরকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি, ও রাজুর হাত ধরে, ওদেরই বাড়ির সামনে গলি পেরিয়ে চলেছে। কেরোসিনের ল্যাম্পপোষ্টের আলো জ্বলছে টিম্ টিম্ করে জোবেদা মাসির বাড়ীর সামনে। বাঁদিকে ফরওয়ার্ড মেডিকেল ছাত্রাবাসের উঁচু পাঁচিলের উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে নারকেল গাছের ছায়া। তারপরে বালিকা বিদ্যালয়, ডানদিকে সাহাদের বাড়ি। গলিতে চাঁদের আলো তেমন স্পষ্ট হয়ে পড়েনি। কিন্তু ওদের এসবের দিকে কোনো খেয়াল নেই, ওরা দুটিতে হাত ধরাধরি করে চলেছে ওদের গন্তব্যে।

কিন্তু আমি কি দেখতে পাচ্ছি? দশ বছরের দুই বালক বালিকার এই যাওয়া, ওদের জীবনের ক্ষেত্রে এক গভীর অর্থব্যঞ্জক, ভবিষ্যতের সারা জীবনের ক্ষেত্রে, এর প্রতিক্রিয়া অতি ব্যাপক। দুটি বালক বালিকার এই হাত ধরাধরি করে যাওয়ার মধ্যে আমি শুনতে পাচ্ছি, সংসারের চির নরনারীর যাত্রার পদধ্বনি। ও নিজে জানে না, এই শুক্লা সন্ধ্যায়, হঠাৎ কেন রাজুকে ওর পুঁইমেটুলির রঙ দিয়ে রাঙিয়ে সাজাতে ইচ্ছে করলো, রাজুও জানে না, ও কেন নিজের মুখখানি আগ্রহে বাড়িয়ে দিল সাজবার জন্য। প্রকৃতি নিজেই বা কেন, এই কুহেলী জ্যোৎস্নায় রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যামালতীর গন্ধ উড়িয়ে ব্যাকুল করে তুলেছে হেমন্তের সন্ধ্যাকে, প্রকৃতির নিজের হয়তো জানা নেই। দুটি বালক বালিকার প্রাণে এনে দিল এক জোয়ার, ওরা হাত ধরে চললো দোলাই খালের ধারে, রাম-সীতার মন্দিরে। বাড়ির কথা, বাবা মায়ের কথা, শাসনের ভয় কিছুই ওদের বাধা হয়ে দাঁড়ালো না, মনের সীমান্তে কোনো দ্বিধার প্রশ্ন জাগলো না, বালকের আজ হঠাৎ রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, ঘরের এই সীমানায় ওর ভালো লাগছে না, ইচ্ছে করছে অন্য কোথাও যেতে, রাজুকে নিয়ে।

কেন এমন মনে হলো? অবিভাবকেরা যার প্রতীক্ষায়, যাদের এখন বই খাতা নিয়ে পড়াশুনা করতে বসার সময়, সহসা এই বিপরীত, এবং অনুচিত ইচ্ছা কেন জাগলো?

মহাপ্রাণের রহস্য সেইখানে। জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়ে এসে, আজও এমন কথা নিশ্চয় করে বলতে পারবো না, মহাপ্রাণের সকল রহস্য উদঘাটিত করতে পেরেছি। জীবনের গতি প্রকৃতি এই রকম—তার কিন্তু স্রোতের ধরতাই মেলে না, সহসা একদিন জীবনের গতি বদলিয়ে যায়। সংসার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আমি দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতের এক পরিণত পুরুষের মন, সহসা এই সন্ধ্যায়, অঙ্কুরিত হয়ে উঠল বালকের মনে। চির পুরুষের চির প্রেম এই মাত্র জন্মলাভ করলো বালকের মনে, আর তা বালিকার মনে স্পর্শ করে, তার প্রাণে এনে দিল, চির নারীর চির প্রেম। এখন ও আর সমরেশ না, রাজু নয়, লেবু সাহার কন্যা রাজলক্ষ্মী, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি সকলেই পড়ে থাকলো পিছনে। যাত্রা করেছে চির প্রেমিক প্রেমিকা।

...

যে বালকের নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে যাওয়া নিয়ে এত কথা, আসলে সেটাও ঘটেছে ওর স্বধর্মে। এর নাম হৃদয়ের ক্ষুধা। তবে হ্যাঁ, এই দূরকালের সীমায় বসে, একটা কথা মানতে হচ্ছে। দিবসের গলির তল্লাটে, সুরথ নামে বালকটির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংসারের শৃংখলিত নিয়ম কানুনের প্রবাহের; এরকম কিছু কিছু বালককে চিরদিনই দেখা গিয়েছে, ব্যতিক্রমের রাস্তা ধরে তারা চলে। কবি এদের সম্পর্কেই 'ছিন্নবাধা পলাতক বালক' বলেছেন কী না জানি না। হতে পারে। সারাদিন বাঁশি বাজিয়ে ফেরা বালকটি আবার কর্মে ফিরে আসে। সেইখানেই তার তফাত আর দশটি বালকের সঙ্গে।

আমি দেখতে পাচ্ছি, তাবত ছেলের দল যখন, মাঞ্জা দেওয়া সুতোর লাটাই নিয়ে, আকাশে উড়িয়ে দিয়েছে নানা রঙের গাহেল, পংখীরাজ আর পেটকাটা দোভাজ, প্যাঁচ লড়ছে। ভো-কাট্টা করছে হেমন্তের নীল আকাশ জুড়ে, আর চিৎকার করে লুটছে, ওর বালিকা সঙ্গিনীর জন্য, মহাপ্রাণে টান ধরেছে।

...

সুরবালা তাঁর এমব্রয়ডারিতে সুঁচ ফোটাতে ফোটাতে কিছুটা নিস্পৃহ সুরে জিজ্ঞেস করলেন, তোর ছোট কাকীকে বুঝি তুই খুব ভালবাসিস?



বালক মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো। সুরবালা ওর মুখের দিকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, মনে মনে কষ্ট পেয়েছিস, তাই কাঁদছিলি, না?

বালক আবার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো। সুরবালার মুখ গম্ভীর, চোখ নামালেন এমব্রয়ডারির দিকে। আর কোনো কথা নেই। সুরথের অস্বস্তি হলো। ও ওঠবার উদ্যোগ করল। সুরবালা বলে উঠলেন, কোথায় যাচ্ছিস?

বালক বললো, মাকে খুঁজতে।

সুরবালা বললেন, দিদি ঠিক সময়েই আসবেন। টোকানি সঙ্গে গেছে। তুই বোস। একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন, এখন বুঝতে পারছি, ছোট কাকী আসার পর থেকেই তুই আমাকে আর কেন গান শোনাতে আসিসনি। ছোট কাকীকে বুঝি রোজ গান শোনাতিস?

বালক কিছুটা অপ্রস্তুত সন্দিগ্ধ চোখে, এমব্রয়ডারিতে রত সুরবালার মুখের দিকে তাকালো। বললো না, ছোট কাকী কখনো আমার গান শুনতে চায়নি।

সুরবালা চোখ তুলে সুরথের দিকে চোখ তুলে দেখলেন। আবার ফ্রেমের দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, অনেক দিন তোর গান শুনিনি। এখন গান কর। বালক জিজ্ঞেস করলো, কোন গান করব? সুরবালা চোখ না তুলেই বললেন, সেই গানটা কর, কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন রাধা যা গেয়েছিল।

আমি দূরকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি, বালকের প্রাণ এক রুদ্ধ কষ্ট আর আবেগের দ্বৈত ধারায় আবর্তিত হচ্ছে। ও ওর স্বাভাবিক চড়া সুরে গান ধরলো :

সখী আমি অভাগিনী, নন্দের নন্দিনী
রাজা মহারাজ জানি নাই
গোপালের পায়ে দিয়েছিনু সঁপে
পেয়েছিনু তাঁর প্রেমের ঠাঁই।

সুরবালার স্খলিত হাত থেকে এমব্রয়ডারি ফ্রেম খাটের উপর পড়ে গেল। চোখের কোণ দুটি চিকচিক করে উঠলো। বালক গাইলো :

কে জানিত গো সে যে রাজা হবে
রাজা হয়ে মথুরায় যাবে
সে যে রাজা হবে,
কে জানিত...
এখন এ অভাগিনীর কি বা গতি?
এ পাষাণ প্রাণ কঠিন অতি
অভাগিনীর কি বা গতি?

সুরবালার চোখের কোণ থেকে গালে ধারা নামলো। বালক আপন আবেগে গাইলো :

নাহি যে বিদরে নাহি যে ভাঙেরে
শ্যাম শ্যাম করে জীয়ন্ত মরিবে।
বলো বলো ওগো আমার কী গতি...

সহসাই বালকের স্বর রুদ্ধ হলো। স্খলিত ভাঙা স্বরে, বলে উঠলো, মেজো মাসী, আমি গাইতে পারছি না।

সুরবালা তৎক্ষণাৎ বালককে বুকের মধ্যে দুহাতে টেনে নিয়ে, কোলের শিশুর মতো চেপে ধরলেন।

ফিসফিস করে বললেন, তবে থাক, তবে থাক। এক প্রোষিতভর্তৃকা নারী কেঁদে ভাসতে লাগলেন। তাঁর বুকের মাঝে বালকের চোখের জল গলতে লাগলো।

(মূল রচনার নির্বাচিত অংশের পুনর্মুদ্রণ, বানান অপরিবর্তিত)

ইচ্ছে বিরক্তি রাগ, বেফাঁস কিছু কথা

আচ্ছা, আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজটা কী? তিনি যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তখন তাঁর মুখ্য অফিস নিশ্চয়ই দিল্লিতে। সেখানে বসে দপ্তরের মূল মন্ত্রীর নির্দেশে তাঁকে কাজ করতে হবে। গোটা দেশ থেকে যে সব সমস্যার সমাধান চেয়ে পাঠানো হয় তা সমাধানের দায়িত্ব তাঁদের নিতে হয় কারণ দপ্তরের মূল মন্ত্রীর পক্ষে সব দেখে ওঠা সম্ভব নয়। আমরা তো এটাই জানতাম।

নির্বাচনের পর জোট বাঁধার পরে তৃণমূল সাংসদদের সংখ্যা অনুযায়ী দল অন্তত চারটে পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেতে পারত। অথচ দলের নেত্রী নিজে রেল দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে ছ'জনকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক মহল যেমন অবাক হয়েছিল, আমরা, সাধারণ মানুষও কম বিস্মিত হইনি। একজন রাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাজ করতে হয় তাঁর দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী। অতি সামান্য ক্ষেত্রে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মুকুল রায় ইচ্ছা করলেও হলদিয়া বন্দরটির চেহারা বদলাতে পারবেন না। দীনেশ ত্রিপাঠি তাঁর পূর্ণমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া একটি নতুন হাসপাতাল তৈরি করতে পারবেন না যেখানে আধুনিকতম চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। তিনি যদি আর একটা অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিসিন কলকাতায় করতে চান এবং তাঁর বস যদি সেটা নাকচ করে দেন তা হলে তাঁকে সেটা মেনে নিতে হবে। বস্তুত গত ছ'মাসে এইসব রাষ্ট্রমন্ত্রীরা তাঁদের দপ্তরের হয়ে এমন একটিও কাজ করেননি বা করতে পারেননি যা তাঁদের মন্ত্রী হওয়ার পর মানুষ আশা করেছিল।

অথচ রেল ছাড়া আরও তিনটি দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ ছিল। যদি উন্নয়নের কথাই বলা হয়, এই ছ'মাসে রেল দপ্তর যত কাজ করেছে, ওই তিনটে দপ্তরের পূর্ণ দায়িত্ব পেলে তার চারগুণ বেশি কাজ করা যেত। প্রায় প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন উদ্বোধন করে রেলমন্ত্রী যত মানুষের চিত্ত জয় করেছেন তার চারগুণ মানুষকে তিনি তাঁর সঙ্গে পেতেন। প্রশ্ন হল, এমন সোনার সুযোগ তিনি হেলায় হারালেন কেন?

কলকাতা ময়দানে কিছু ফুটবল ক্লাবকে নিজের প্রাণ বলে মনে করতেন এমন মানুষকে আমরা জানি। মোহনবাগানের ধীরেন দে যেমন তেমন টালিগঞ্জ ক্লাবের মন্টু ঘোষ। এঁদের কথাই ছিল শেষ কথা। এঁরা ক্লাবকে এমন ভালবাসতেন যে নিজের ক্ষতিও গ্রাহ্য করতেন না। ক্লাবে তাঁদের সমালোচনা করা লোকের অভাব না থাকলেও কেউ মুখ খুলতে সাহস পেতেন না। কাউকে কোনও দায়িত্ব দিলেও দড়ির প্রান্ত নিজের হাতে রাখতেন। কেউ মাথা চাড়া দিতে চাইলেই দেখা যেত তাঁকে ক্লাব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেকালে এটা যত প্রকট ছিল একালে ততটা না হলেও রয়েছে। সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট যুগ যুগ ধরে পদ আঁকড়ে আছেন। অন্যেরা কাছে আসতে চাইলে টিকতে পারেননি।

স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, যে দল তৃণমূল নেত্রী নিজের হাতে গড়েছেন সেই দলে তাঁর সমান পদমর্যাদা আর কেউ পান তা মেনে নিতে তিনি পারেননি। সুলতান আহমেদ যদি পূর্ণমন্ত্রী হয়ে পশ্চিমবাংলার পর্যটন শিল্পের চেহারা বদলে দিতেন, সুন্দরবন থেকে ডুয়ার্সে হাজার হাজার মানুষ সহজে যেতে পারত, তাদের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত হত, জঙ্গলের প্রাণীদের বিরক্ত না করে ঘুরে দেখানোর আয়োজন হত এবং তিনি তাঁর দিদির ঘোষণা অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে ডুয়ার্সকে প্রায় সুইজারল্যান্ড তৈরি করে দিতেন, তা হলে? ওই দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রিত্ব সুলতান আহমেদ পেলে প্রচুর বেকার ছেলে যেমন চাকরি পেত তেমনি দেশটার চেহারা অনেকটাই সুন্দর হত।

কিন্তু সুলতান আহমেদ পদমর্যাদায় নেত্রীর অনেক নীচের দিকে, পূর্ণমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রীসভায় নেত্রীর পাশে তাঁকে বসতে দেওয়া যায় কী করে?

সৌগত রায়ের মত প্রবীণ, অভিজ্ঞ, শিক্ষিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে এমন দপ্তরের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী করা হল যেখানে তাঁর তেমন করণীয় কিছু নেই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কলকাতায় থাকতে পারেন তিনি। অতীত অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁর এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্যতা ছিল পূর্ণমন্ত্রী হওয়ায়। কিন্তু তা হলে প্রচারের ক্যামেরা যদি শুধু তাঁদেরই হাজির করে তা হলে আগামী পরশু তাঁরা অন্য কথা বলার সাহস পেয়ে যেতে পারেন। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একা দল করে নেত্রী স্থির করেছেন, যা করবেন তিনি একলা করবেন। মিছিলের কারণে এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে তাঁর গাড়ি আটকে গেলে পুলিশ বিকল্প ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তিনি মাইলের পর মাইল হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছবেন। বেচারা



সৌগত রায়রা তাঁদের ভারি শরীর নিয়ে তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম না-হয় খানিকটা খেলেন।

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রথমবার মন্ত্রী ছিলেন শ্রীজ্যোতি বসুর মন্ত্রিসভায়। তখন তাঁর কথাবার্তা এবং আচরণ সাধারণ মানুষের মতো ছিল। তাঁকে আমি চিনতাম তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকে। প্রচণ্ড পড়ুয়া ছেলে ছিল সে। বাংলা সাহিত্য ছাড়াও ইংরেজি সাহিত্যের খবর রাখতেন তিনি। শ্যামবাজার অঞ্চলের রেস্টুরেন্টে তাঁর আড্ডার কথা এখনও আমাদের মনে আছে। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হত বইমেলার গিল্ডের অফিসে। প্রতিবারই নিয়মিত আসতেন তিনি। তখন তাঁকে ঘিরে প্রকাশক বা লেখকরা তো বটেই, কিছু বড় আমলাও কথা না বলে বসে থাকতেন। মনে আছে, আমি তাঁকে তুমি বলে সম্বোধন করেছিলাম আগের অভ্যেস অনুযায়ী এবং তিনি সে কারণে বিন্দুমাত্র অখুশি হননি। কিন্তু তাঁর পার্শ্বদরা বিরক্ত হয়েছিল। তাঁদের মতে, আগের পরিচয়ে এখন কথা বলা ঠিক হয়নি। যেহেতু উনি এখন মন্ত্রী তাই আপনি বলাই উচিত ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ব্যবহারে আমি কোনও পরিবর্তন তখন দেখতে পাইনি। জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে একটি প্রবন্ধের বই লিখেছেন। হালফিল সাহিত্যের খবর রাখেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন আসছিল। যে তিনি প্রতিবাদ করে মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেই তিনি ক্রমশ কথাবার্তায় উদ্ধত হয়ে উঠলেন। তাঁর ঠোঁটের হাসিটা কীরকম ব্যঙ্গাত্মক হয়ে গেল। এবং সবশেষে চাটুকার এবং সমালোচকদের চিহ্নিত করতে বললেন, 'আমরা এবং ওরা'। এ নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হল।

তৃণমূল নেত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শিক্ষা নিলেন। টালিগঞ্জ স্টেশনের নতুন নামকরণ করার দিনে তিনি মঞ্চে তাঁদেরই ডেকে নিলেন যাঁদের গায়ে বামফ্রন্টের গন্ধ নেই। অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে মঞ্চ ভরালেন কিন্তু শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ রায়, শ্রীসব্যসাচী চক্রবর্তীকে সরিয়ে রাখলেন। এই মুহূর্তে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বাঙালি গর্ব করতে পারে।



এই প্রাচীন অভিনেতার বিকল্প দূরের কথা, ওঁর মানের কাছে আসতে পারেন এমন শিল্পী খুঁজে পাওয়া যাবে না। উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানাতে যে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন হল সেখানে আসার সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা ছিল উত্তমকুমারের সহশিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত রেলমন্ত্রী শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে 'ওরা'র দলে রেখে বাতিল করলেন।

তারপর শুরু হল 'আমরা'র নির্লজ্জ প্রচার। কোনও নতুন স্টেশন অথবা রেললাইনের উদ্বোধনের দিনে খবরের কাগজে বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে। সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কারা হাজির থাকছেন? কাগজের বিজ্ঞাপন বলছে এঁরা সেইসব তৃণমূল সাংসদ যাঁরা রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন। অর্থাৎ শিলিগুড়ির কয়েকশো মাইলের মধ্যে কোনও সমুদ্র বা জাহাজ না থাকা সত্ত্বেও জাহাজ-প্রতিমন্ত্রী মুকুল রায় সেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকছেন। কেন? তাঁর কি জাহাজ দপ্তরের কোনও কাজ সেসময় নেই? থাকছেন সেই এলাকার যদি কোনও তৃণমূলের বিধায়ক বা সভাধিপতি থাকেন তাঁরা। কোনও বিরোধী নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। কারণ তাঁরা 'ওরা'-র দলে পড়েন। যেখানে বামফ্রন্টের সাংসদ বা বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সেখানে নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করার সময় ইচ্ছে করে তাঁকে উপেক্ষা করার মধ্যে দিয়ে রেলমন্ত্রী জানিয়ে দেন তাঁর সংসারে কারা থাকবেন তা তিনিই ঠিক করবেন। এই কারণে শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত মেয়র আমন্ত্রণ পান না। রেলমন্ত্রী যদি মুখ্যমন্ত্রীর শিক্ষায় শিক্ষিত হন তা হলে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু ওই ছ'জন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীকে ছায়ার মতো নিয়ে তিনি একটা নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। মজার কথা হল, রেলের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই ধরনের অনুষ্ঠানে বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়। কিন্তু রেল কোনও রাজনৈতিক দলের নিজস্ব দপ্তর নয়। ওই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জবাবদিহি দেবেন প্রধানমন্ত্রীকে। রেল ভারত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অথচ বিজ্ঞাপনগুলোতে নেত্রীর ছবি, কখনও এক আধবার রাষ্ট্রমন্ত্রীদের মুখ ছাপিয়ে যে প্রচার করা হচ্ছে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনও অস্তিত্ব নেই। ব্যাপারটা নিয়ে কথা শুরু হলে রেলমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে অনুষ্ঠান শ্রীনগরে অথবা দ্বারকায় হলে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকত, ছিলও। কিন্তু যেহেতু অনুষ্ঠানগুলো পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে তাই প্রধানমন্ত্রীর ছবি না রাখলেও চলবে। তা হলে কি আমরা ধরে নেব পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ নয়? পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে ভাবছেন? যে বেশি কথা বলে সে কিছু বাজেকথা বলতে বাধ্য। এই প্রবাদবাক্যটি মনে পড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই যে নিজের দপ্তরের কাজ ফেলে রেখে মাননীয়া রেলমন্ত্রীর পিছন পিছন ঘোরাফেরা, এতে তো খরচও হচ্ছে। কাগজের বিজ্ঞাপন বাবদ প্রচুর অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে। এতে কার লাভ হচ্ছে? কয়েকদিন আগে রেলমন্ত্রী তাঁর বাহিনী নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন করে বেদিতে নিজের নাম লিখিয়ে এলেন। পরেরদিন এলাকার মানুষ দেখলেন সেই বেদি উধাও হয়ে গিয়েছে। স্টেশন মাস্টার জানালেন রেল দপ্তরের অফিসাররা এসে বেদি তুলে নিয়ে গিয়েছে। জানা গেল ওই জমি রেলের নয়, একজনের সঙ্গে মামলা চলছে। ফলে যত আবেগ, উৎসাহ তৈরি হয়েছিল তার বাতাস বেলুন থেকে বেরিয়ে গেল। এই ঘটনা থেকে রেল বা জনসাধারণের বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। হয়েছে খবরের কাগজের। তাঁরা বিজ্ঞাপনগুলো ছেপেছিলেন, রেল তাঁদের বিজ্ঞাপন বাবদ টাকা দিতে বাধ্য।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের আগের রেলমন্ত্রীরা ভয়ঙ্কর কঞ্জুস ছিলেন। নতুন প্রকল্প দূরের কথা, প্রত্যেক বছর বাজেটের সময় টিকিটের দাম বাড়িয়ে সাধারণ যাত্রী অথবা অসাধারণদের বিপাকে ফেলতে ভালবাসতেন। অথবা তাঁদের দপ্তরে কী সম্পদ আছে তা তাঁরা খবরই রাখতেন না। বর্তমান রেলমন্ত্রীর আগের অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই তিনি জানেন জনগণের সেবার জন্যে কত কোটি কোটি টাকা খরচ করা যায়, বাংলাদেশকেও রেল-সংক্রান্ত সাহায্য স্বচ্ছন্দে করা যায়। মন্ত্রী হওয়ার ছ'মাসের মধ্যেই গড়িয়া পর্যন্ত মেট্রোরেল সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে যত নতুন ট্রেন চালু করেছেন, নতুন লাইন বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিতপ্রস্তরে নিজের নাম লিখিয়েছেন তা একদা-রেলমন্ত্রী আবু বরকত গণিখান চৌধুরীও ভাবতে পারেননি। তিনি রেলমন্ত্রী হয়ে মালদাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে গেল গেল রব উঠেছিল, আঞ্চলিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমান রেলমন্ত্রীর সেই সমস্যা হচ্ছে না। তিনি দিঘার সমুদ্র আর ডুয়ার্সের পাহাড়কে রেলের মাধ্যমে একত্রিত করছেন। মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মানুষকেও খুশি করছেন। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ছিদ্রান্বেষীরা গাঁইগুঁই করবেনই। এত নতুন ট্রেন চালু হচ্ছে, কামরাগুলো আসছে কোত্থেকে? ওগুলো কি এতদিন কারশেডে পড়েছিল? রেলমন্ত্রী সেগুলোকে পরিষ্কার করে চালু করলেন? ওইসব নতুন ট্রেন, লাইন বানাতে নতুন লোকের দরকার হচ্ছেই। তার মানে রেলমন্ত্রী জানতেন রেলে প্রচুর লোক কাজ না পেয়ে বেকার বসে থাকে। অতি কম দামের টিকিটে দ্রুতগামী দুরন্ত রথের ভাবনা তো তাঁর মাথা থেকেই এসেছে। তিনি সঠিক বুঝে মানুষের উপকারে রেলকে ব্যবহার করছেন। আর তখনই আপশোস হয়, আরও দু'টো পূর্ণমন্ত্রিত্ব যদি নেত্রী ছেড়ে না দিতেন তা হলে আমরা তিনগুণ উপকৃত হতাম।

ওই ছিদ্রান্বেষীরা তো কথা বলবেনই। তাঁরা নাকি দীর্ঘকাল নেত্রীকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন নেত্রী কিছুদিন কাউকে খুব গুরুত্ব দেন, তাঁর পরামর্শ শোনেন, তাঁকে ছেঁটে ফেলে আর একজনকে গুরুত্ব দিতে দ্বিধা করেন না। তাঁর মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই কমপিউটার নয় যে দেশের সব সমস্যার উত্তর চটজলদি বলতে পারবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অন্তত আশিভাগ ক্ষেত্রে তিনি ভুল বলেন না। মাঝে মাঝে রাজার মতো তাঁকেও কান দিয়ে দেখতে হয়। আর ভুলটা হয় তখনই। ভুক্তভোগীরা জানেন সেদিন উল্টোডাঙায় তাঁর দলের অবরোধ এমন জঙ্গি ছিল যে আগুন নেভাতে আসা দমকল বাধা পেয়েছিল। তাঁকে বোঝানো হল ওই বাধা দিয়েছিল সিপিএমের অটোচালকরা রাস্তা অবরোধ করে। তাঁকে বলা হয়েছে আগুন ধরার অনেক পরে দলের অবরোধ আন্দোলন শুরু হয়। তিনি সেই কথাই সোচ্চারে বললেন। অথচ অটোচালকদের আন্দোলন আর তৃণমূলের অবরোধ মিলেমিশে এমন দঙ্গল পাকিয়ে গিয়েছিল যে দু'দলের কেউই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

যেসব তৃণমূল নেতা বা নেত্রী শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধে বিশ্বাস করেন না তাঁদের মানুষ নেত্রীর পাশে দেখতে চান না। সেদিন টিভিতে নেত্রীর পাশে হাঁটতে দেখা গেল এমন একজনকে যিনি থানায় গিয়ে পুলিশকর্তাকে অশ্লীল গালাগাল দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁকে আর প্রচারের আলোয় আনা হয়নি। এই মহিলাকে সেদিন নেত্রীর পাশে দেখতে পেয়ে মানুষ খুশি হয়নি।

বামফ্রন্টকে পশ্চিমবাংলার মানুষ বাতিল করতে চাইছে। কংগ্রেস তাদের বিকল্প এই রাজ্যে নয়। নেত্রীকে মানুষ সমর্থন করছে তাঁর বামবিরোধিতায় কোনও ভেজাল নেই এটা প্রমাণিত হওয়ার পরে। তাঁর কোনও আদর্শ আছে কি না, মা-মাটি-মানুষ শুধু আবেগের স্লোগান কি না এ নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে না। তারা একজন সৎ মানুষের ওপর নির্ভর করতে চাইছে। কিন্তু তাঁর দলের পক্ষে যিনি বিরোধী নেতা, তিনি টিভি চ্যানেলে রায় শুনে মঞ্চ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেই। ওই অনুষ্ঠানে দর্শক ও অন্যান্যদের রায় ছিল, অবরোধ এবং ধর্মঘট মানুষকে বিড়ম্বিত করে।

নেত্রী কি এঁদের সৌজন্য শেখানোর কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন না?


ছোট, বড় সবার।
স্পোর্টস্ ও ক্যানভাসের বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
28513
Rs 748/-
Genesis 2878
Lindsay Street 033 22861510/11 Free School Street (Opp. Fire Brigade) 033 22861506
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।

ঈশ্বরের গর্ত

বাণী বসু

চতুর্থ অধ্যায়

সন্দীপন পাঠশালা

ইশ্‌শ্‌ কেন যে পুণ্য হচ্ছে না! অথচ সে মাছ খাচ্ছে না, জীবহিংসা একদম করছে না, দরজার পাটের আড়ালে আরশুলাটাকে সে ছেড়ে দিয়েছিল, এমনকী একটা লাল পিঁপড়ে তাকে মোক্ষম কামড়েছিল সে টুসকি মেরে তাকে শুধু ফেলে দিয়েছিল গা থেকে। মোটেই মারেনি। খিদের চোটে যা কখনও খায়নি সেই শাকচচ্চড়ি সে খেয়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন, কতক্ষণ ধরে সে হাওয়া করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে, হাত ভেরে যাচ্ছে একেবারে। যতক্ষণ না এত্তবড় গোল টিপ পরা দুর্গা মাসিমা এসে তার হাত থেকে পাখা কেড়ে নেবেন সে ছুটি পাবে না। শিষ্যের পর শিষ্য আসবে, শুয়ে পড়ে প্রণাম করবে, সন্দেশের বাক্স দেবে, ফুল দেবে, হাত জোড় করে কত কথা কইবে, কেউ বা কাঁদবে, কত দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ, সমস্তর মধ্যে গালচের ওপর আধ-শোয়া হয়ে বসা ঠাকুরকে সে আর বুবু হাওয়া করেই যাচ্ছে, তবু পুণ্য হচ্ছে না। পুণ্য মানে কী বলো তো? ঠাকুরের দিকে চাইতে চাইতে একসময়ে সে কৃষ্ণ কিংবা শিবকে দেখতে পাবে, এমনকী কালী কিংবা দুগ্গামাকেও দেখতে পারো। পমদিদি শিব দেখেছে। প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করবে, বাবার তাই হয়েছে। অত হাসিহাসি মুখ বাবার সে কক্ষনও দেখেনি। ই-দাদা খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও কানপুরে চলে গেছে এখন, পমদিদি বলছে ই-দাদার বরং চাকরি ছেড়ে দেওয়াই উচিত। ঠাকুর বলেছেন—না না সেটা ঠিক নয়, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ আছে, সংসার প্রতিপালনও একটা কাজ, চাকরিও ভগবানের কাজ। যতদিন ঠাকুর থাকছেন, পমদিদিও থাকছে। সুয্যি সারাদিন থাকে না, সন্ধেবেলায় এসে চান করেই ঢুকে যায় ঠাকুরের ঘরে। এই সময়ে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা দরজা বন্ধ থাকে। সব শিষ্যরা, বাবা সু-দাদা, পম-টম সব্বাই সাধন করে। দুগ্গামাসিমা, লক্ষ্মীদি, পারুলদি, অনন্ত জ্যাঠামশাই, রাধুকাকা, গুরুকাকা, অতুলদাদা, রাজেশ তেওয়ারি কাকা সব স-ব। দরজার বাইরে কান পেতে পুনপুন-বুবু শুনেছে ভেতরে যেন ঝড় বইছে। কী শোঁ শোঁ আওয়াজ, বাব্বা! সাধন এমনি! কী ভাবে ঝড়টা ব-ওয়ায়? ঠাকুরের লাঠিটা ঘোরায় আর ঝড় বইতে থাকে না কী? পুটপুটদিদি বলেছিল—এই সব শুনতে নেই। ক্ষতি হয়।

—কার?

—যে শোনে তার। ঝড়ের কথা শুনে তো পুটপুট হেসে বাঁচে না। বলল—দূর! ও তো নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে আর ছাড়ছে।

তারই এত আওয়াজ? বাপ রে সাধন বটে!

ঠাকুরের সমস্ত রুটিনের মধ্যে বুবু-পুনপুন তিল তিল করে তাঁর ভগবানত্ব খুঁজতে থাকে। খুব একটা তর্ক হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে ফিসফিস করে।

বুবু বলে—যদি সত্যি ভগবান হন তা হলে হিসি—আ্যা করবেন না, বল!

পুনপুন বলে—তা হলে তো খাবেনও না।

বুবু বলল—সে হয় তো প্রসাদ করে দিতে খান।

কিন্তু কলঘরটা কেন দরকার হবে? চান অবশ্য করতেই হবে। উনি চান করেন খুব ভোরে। বালতি বালতি জল ঢালার শব্দে তাদের ঘুম ভাঙে যায়। আচ্ছা পমদিদি তো নিজে হাতে রোজ ঠাকুরের কলঘর পরিষ্কার করে। ওকে জিগ্যেস করলে হয় না?

—তুই এত বোকা! জিগ্যেস করবি আর পমদিদি বলবে?

মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী যাঁকে সবাই ঠাকুর বলে, তিনি সত্যি সত্যি সাক্ষাৎ ভগবান কিনা এই প্রশ্নের উত্তর কী করে পাওয়া যায়? সমস্যাটা যাকে বলে ভাইটাল।

অবশেষে বহু ভাবনাচিন্তা করে দু'জনে গুটিগুটি কলঘরের দিকে এগোয়। এইবেলা সব্বাই ঠাকুরের ঘরে গম্ভীর গম্ভীর কথা বলতে ব্যস্ত। রাস্তার দিকে দালানের সমস্তটা খড়খড়ি দেওয়া জানলা। সব খোলা এখন, রোদে ভাসছে দালান, গলি সব। দালানের মোড়ে এই সরু মতো গলিটাই কলঘরে যাওয়ার পথ। দু'জনে উঁকি মারে কলঘরে। কলের তলায় নতুন অ্যালুমিনিয়ামের বালতি বসানো, পাশে বড় মগ। ঠাকুরের লাল গামছা পরিষ্কার করে কাচা, গলির তারে শুকোচ্ছে। কলঘর ঘষা মাজা ধোয়া পোঁছা। কোথাও একফোঁটা জল পড়ে নেই। পাশেই পায়খানা। ওখানে গামছা পরে যেতে হয়, ঢুকলে জামাকাপড় ছাড়তে হয়। কিন্তু ঠাকুরের তো! তাই এখন একেবারে পবিত্র। দু'জনে দু'টো ধাপের ওপর দিয়ে উঁকি মারে। নাঃ, প্যান ধবধবে পরিষ্কার, ফিনাইলের গন্ধ বেরচ্ছে, সেই সঙ্গে সেই মৃদু ধূপের গন্ধ। এইটাকেই অতএব ভাইবোনে ঠাকুরের গন্ধ, এমনকী তাঁর মলমূত্রের গন্ধ বলে শনাক্ত করে। নিশ্বাস ফেলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। তাদের মলমূত্রের সঙ্গে ঠাকুরের মলমূত্রের একটা মৌলিক তফাত ধরা পড়ল তা হলে। তাদেরটাতে দুর্গন্ধ, ঠাকুরেরটাতে ধূপের গন্ধ। কিন্তু এইটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ? মনের মধ্যেটা এখনও কেমন খচখচ করছে।

টুকটুক করে পালিয়ে আসে দু'জনে।

দুপুর বারোটা। খাবারঘর তকতক করছে। এও পমদিদির হাতের কাজ। অন্যের ওপর ছেড়ে দিলেই হয়েছিল আর কি! পমদিদি নারকোলের দড়ি পাকিয়ে, তাই দিয়ে সোডা সাবান দিয়ে খাবারঘর পরিষ্কার করেছে, খাবারঘরের চেহারা ফিরে গেছে।



ঘরটায় দু'টো দরজা। একটা রান্নাঘরের দিকে, আরেকটা দালানের দিকে। দালানের দিকটা ভীষণ ভিড়। লোক গিজগিজ করছে একেবারে। কেন না ঠাকুরের ভোগ এখন। ঘরের মধ্যে নতুন পিঁড়ি পাতা, পিঁড়ির ওপর ছাঁটা ফুলের আসন। এটা টমদিদি আর পুটপুটদিদি মিলে করেছিল রথীন জামাইবাবুর জন্যে। জামাইবাবু একদিনও বসেননি, তাই একদম নতুন আছে। পমদিদি নিয়ে এসেছে। আসনে গিয়ে বসলেন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, জ্বলজ্বলে চোখমুখ, বড়সড় চেহারার ঠাকুর। সব দাদাদের থেকে, সব শিষ্যদের থেকে লম্বা। সামনে রুপোর থালায় বাটি উপুড় করে পরিপাটি ভাত সাজানো। পাশে পাশে পটলভাজা, বেগুনভাজা, আলুভাজা, রুপোর বাটিতে মুগের ডাল, সোনার মতো রং, আরও কী কী সব তরকারি, বড় বাটিতে ক্ষীর, জামাট একেবারে, তার

ওপর কিশমিশ, বাদাম, পেস্তা সব ফুটে ফুটে রয়েছে।

রান্নাঘরের দরজাতেও ভিড়, তবে সেগুলো সব চেনা লোকের, দিদিরা, আশপাশের বাড়ির দিদি-মাসিরা। টুঁ মেরে মেরে দু'জনে সেদিক দিয়েই ঢুকে গেছে। লালশালুর ঝালর দেওয়া বড় পাখা নিয়ে হাওয়া করছে পমদিদি। হাতে খানিকটা জল নিয়ে কী সব মন্ত্র পড়তে পড়তে থালার চারিদিকে ছিটিয়ে দিলেন ঠাকুর। মানে, ভূত পেতনিরা আর আসতে পারবে না। কেন যে তারা আসতে চাইবে তা অবশ্য তাদের বোধগম্য হল না। ভূত পেতনিরা ঘোরে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে, পচা ধসা, দুর্গন্ধ জিনিসেই তাদের প্রধান আকর্ষণ। যাই হোক, ঠাকুর এখন ভাতের ওপর আঙুল রেখে চোখ বুজিয়ে রয়েছেন। আরও মন্ত্র পড়ছেন তার মানে। ডানহাতের আঙুলগুলোকে ছোট্ট করে জড়ো করে ঘি দেওয়া ভাত মাখলেন, একটু ডাল মাখলেন পটলভাজা দিয়ে, এতটুকু একটা গরস করে খেলেন, পুনপুনের জিভে টসটস করছে জল। কী সুন্দর করে খাচ্ছেন, কী সুন্দর তরকারির রং, অর্ধেকটা ভাত খেলেন, তারপর ক্ষীরের বাটিতে চুমুক দিলেন, বুবু দেখল অর্ধেকটা, ঠিক আধবাটি খালি হয়ে গেল। জল খেলেন। তারপর সোজা হয়ে বসলেন, বুবুর মনে হল ওঁর ভাল করে খাওয়া হল না, এত লোক ঘিরে ধরে খাওয়া দেখলে আবার কেউ খেতে পারে না কি?—লজ্জা করবেন না, ভাল করে খান, আরেকটু শুক্তো দেব না কি? দিই?—এরকম করে পিসিমা মা কেউ তো কিছু বললেনও না।

একটা বড় কাঁসার গামলা নিয়ে এল পমদিদি, পারুলদি (অনেক বড়, কিন্তু দিদিই বলতে হয়, সব গুরুভাই গুরুবোন) হাতে জল ঢেলে দিতে লাগলেন। ঠাকুর হাত ধুয়ে তাতেই মুখ নিচু করে কুলকুচো ফেললেন। কী রে বাবা, অসুখ করলে তবে তো মানুষ গামলায় মুখ ধোয়।

এবার খড়মের শব্দ তুলে খটখট খটখট করে ঠাকুর দোতলায় উঠে গেলেন। আর অমনি দালানের দরজার ভিড়টা ঘরের মধ্যে ভেঙে পড়ল। পেসাদ! পেসাদ! পেসাদ!

পারুলদি কড়া গলায় বললেন—আমি সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছি, আপনারা অমন করছেন কেন? সরে যান, ঘর থেকে বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, নইলে আমি কিছুই করতে পারব না।

লোকেরা সরে গেলে, ভাতটাকে তরকারি দিয়ে মেখে ছোট ছোট গুলি পাকালেন পারুলদি, থালাটা বয়ে দরজার কাছে গেলেন, গুলিগুলো সবাইকার হাতে হাতে দিতে লাগলেন। মাথায় ঠেকিয়ে সব হুপ হুপ করে খেয়ে নিতে লাগল। একজন বলল—অম্রিত, অম্রিত!

আরেকজন বলল—এ হল টাটকা মহাপ্রসাদ, জগন্নাথদেবের ভোগ তো আর টাটকা গ্রহণ করার সৌভাগ্য হল না!

দু'টো গুলি পেল পুনপুন-বুবুও। তারা ইতস্তত করছিল। মায়ের কড়া বারণ কখনও কারও এঁটো খাবে না।

দুগ্গামাসি বললেন—মাথায় ঠেকিয়ে খেয়ে নাও বাবা, প্রসাদ, কণিকামাত্র, কিন্তু প্রসাদ। জয় মা বলে দু'জনে ফেলে দিল মুখে কণিকামাত্র। কী অপূর্ব! কী অপূর্ব!

একজন কোথা থেকে একটা গেলাস এনে কাতর গলায় বললেন—জলটুকু আমাকে দেবেন, জলটুকু শুধু।

অন্ন প্রসাদ দেওয়া সারা হলে ক্ষীর প্রসাদ দেওয়া শুরু হল। কিন্তু ততক্ষণে বুবু-পুনপুন পগার-পার। একেবারে চিলেকোঠায়, অং-দাদার কাছে।

অংশু যথারীতি টেবিলের ওপর খাতা রেখে কী সব লিখছিল, বলল—কী বিরক্ত করতে এলি তো?

বুবু বলল—নারে অং-দাদা, অম্রিত খেয়ে এলুম।

—অম্রিত! বলিস কি! কোথায় পেলি? দেবতারা কি আকাশ থেকে অম্রিতের কলসি উপুড় করে দিলেন না কি রে?

পুনপুন হাত পা নেড়ে নেড়ে বোঝায়—নারে অং-দাদা, ঠাকুরের প্রসাদ, খেয়ে উঠে গেলেন তারপর আমরা সব গোল্লা গোল্লা খেলুম। কী গন্ধ রে! কী ভাল খেতে! প্রসাদ ওই র'ম হয়?

অং-দাদা ঘুরে বসলো। দেরাদুন রাইস দিয়ে ভাত হয়েছে, সোনামুগ দিয়ে ডাল, বাবা নিজে বড়বাজার থেকে বেস্ট ডাল এনেছেন, আমি সঙ্গে ছিলুম জানি। ঋতি আমাকে বলেছে—সব ভাল ভয়সা আর গাওয়া ঘি দিয়ে রান্না। গন্ধগুলো ওই বাসমতীর বাসের, আর ঘিয়ের বুঝলি বোকচন্দর? ঠাকুরের থুতুর নয়।

—বলিসনি, বলিসনি—পুনপুন সরু গলায় চিকরে ওঠে, পাপ হবে।

—বেশ তো—অং-দাদা বলল—তোদের ঠাকুরকে আমাদের র‍্যাশনের চালের ভাত, জলের মতো কড়ায়ের ডাল আর আলুসেদ্ধ দিয়ে ভোগ দে না, দেখি কেমন অম্রিতের গন্ধ বেরোয়! অমৃত! হুঁঃ। খিদেয় বলে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, এখন উনি এলেন অমৃত বিলোতে। আজ খেতে পাবো? না কপালে নেই? পুটপুট দিদি উঠে এল।—চল রে তোরা খাবি চল।

—আজ কীসের জল? অং-দাদা জিগোস করল।

—কীসের জল, মানে?

—মানে কী আমি জানি না, রেগে বলল অংশু।

খাবার ঘরে লম্বা করে শতরঞ্জি বিছিয়ে আসন হয়েছে। উল্টো দিকে নেমন্তন্ন বাড়ির মতন করে কুশাসন। সামনে সব কলাপাতা। রান্নাঘরে পিসিমা গালে হাত দিয়ে উদাস মুখে বসে আছেন। যে সব শিষ্যরা ওদের বাড়িতে রয়েছেন ক'দিন ধরে তাঁরাও সব খেতে বসেছেন। কলাপাতায় খিচুড়ি পড়তে লাগল—খিচুড়ি আর লাবড়া। দু'গাল খেয়েই অংশু ঝং করে উঠে দাঁড়াল।

—কী হল?

—আমার হয়ে গেছে।

গলসির অনন্ত জ্যাঠামশায় বললেন—একেকজন পুণ্যবানের অমন হয়। প্রসাদ মুখে করলেই পেট ভরে যায়। তবু বাবা, পংক্তি ভোজন হচ্ছে তো! ও দিকে আবার ব্রাহ্মণরা বসে আছেন। তুমি শুদ্দুর, মাঝপথে উঠে পংক্তিভঙ্গ করলে দোষ হয়।

অং-দাদা টং করে পা বাড়াল, কলাপাতা ডিঙিয়ে গেল, তারপর ডিঙি মেরে মেরে রান্নাঘরের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অতুলকাকা বললেন—ডাক্তারবাবুর এই ছেলেটি উড়নচড়ে, ভব্যতা জানে না।

পুনপুন বুবুর দিকে, বুবু পুনপুনের দিকে আড়চোখে তাকাল। উড়নচড়ে, এই ভয়ানক কথাটা তারা আগে শোনেনি। ভব্যতা বোঝা যায়, কিন্তু উড়নচড়ে! নাহ্, সাংঘাতিক শব্দ। নিশ্চয় বিশ্রি কোনও নিন্দের কথা! নদিয়ার অতুলকাকার ওপর তাদের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যায়। অথচ রাত্তিরে এই লোকটির সঙ্গেই এক ঘরে পুনপুনকে শুতে হবে। সে যথাসাধ্য বাবার কাছ ঘেঁষে শোয়, একদিকে বাবা, আরেক দিকে সু-দাদা। কিন্তু এই অতুলকাকার টেনে টেনে নস্যি নেওয়ার আওয়াজ তার বিচ্ছিরি লাগে। এ লোক যে খারাপ হবে তাতে আর সন্দেহ কী!

—কী রে অংশু, উঠে এলি যে! মায়ের ব্যাকুল গলা।

—আপনি জানেন আমি এ সব খিচুড়ি টিচুড়ি খেতে পারি না, তবু...

—একটা দিন, অংশু বাবা, লক্ষ্মী ছেলে, আমি এইখানে তোকে আলাদা করে দিচ্ছি। দিদিমণি...অংশু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—আমি বারো নম্বরে যাচ্ছি। বইখাতা, জামাকাপড় বিকেলে নিয়ে যাব।

হতভম্ব মা পিসিমার সামনে দিয়ে অংশু এঁটো হাতে বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশ)

ছবি : ঈলীনা বণিক


ছোট, বড় সবার।
স্পোর্টস্ ও ক্যানভাসের বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
69402
Rs 299/-
Genesis 2879
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street 033 22861510/11 Free School Street (Opp. Fire Brigade) 033 22861506

নানচাকু

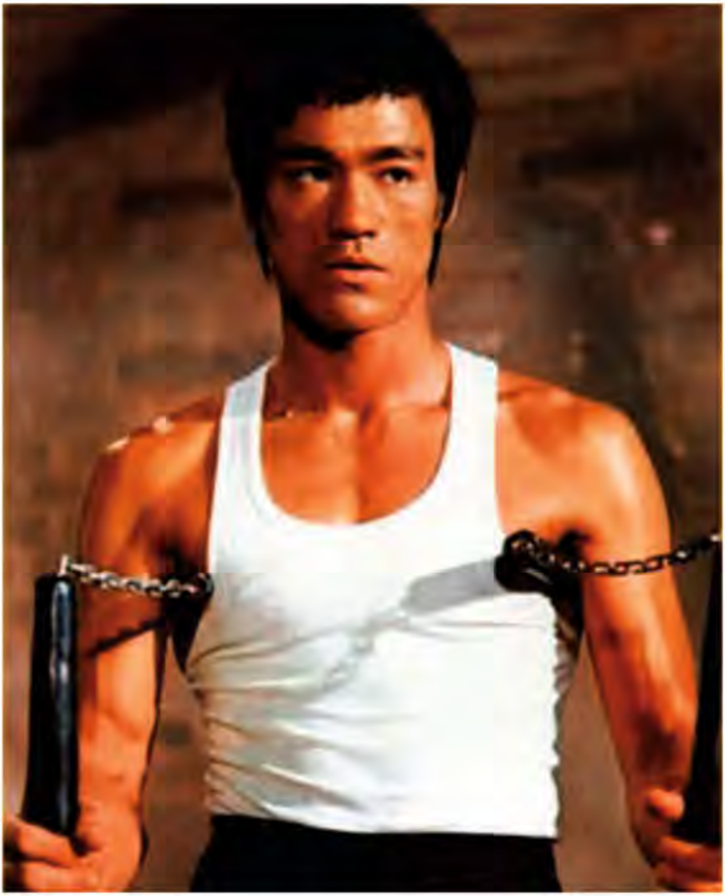
সমস্যাসংকুল লাইফ ছিল তখন। শ্বাপদ শ্রেণির যত আপদ, আশপাশে ঘুরঘুর ঘুরঘুর। আঁচড়াআঁচড়ি, কামড়াকামড়ি, জাপটাজাপটি—সর্বক্ষণ জারি। পায়ে-পায়ে বিপদ। ভয়াল, কুটিল যত ষড়যন্ত্র করোটি-চিহ্ন ছাপ ফেলে যাচ্ছে চোয়ালে, সামান্য অসতর্কতার মাশুল—ঢিসুম। অল্প আনমনা—চাঁদির ওপর খটাস। রোমান্টিক বিকেল মন—রগের পাশ দিয়ে সুইফ্‌ট চিট্রা। রেড অ্যালার্ট জ্বলছে সর্বক্ষণ। যে কোনও মুহূর্তে, যা খুশি ঘটে যেতে পারে। পিরিয়ড থেকে পিরিয়ড মাঝে, আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে। হাত-পাগুলো সব সুড়সুড় করত সে-সময়। টিফিন শেষে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে যত কালো-কালো নটি বয় জুতোর পাল—লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট প্যারেড, কী মনে হল তার একটির, চনমন করে উঠল, আলতো করে সুট বাড়িয়ে দিল—সব ল্যাং-এর বাবা তৈমুর ল্যাং। খামোকা, কথা নেই বার্তা নেই, এমনকী কিচাইন—উহুঁ, তা-ও নেই। গবাদি পশুর মতো গোটা দঙ্গল এ ওর ঘাড়ে সে তার ধারে, ধপাধপ। কারুর থুতনিতে ঘঁষটে গেল অন্যের বুট, কারুর টিফিন বাক্স দু-ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে দিল কমলালেবুর খোসা, কেউ মাড়িয়ে দিল অন্যের খুলে পড়ে যাওয়া চশমা, কারুর কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু'র মলাট ছিঁড়ে গেল চড়চড়। সামান্য, খুব সামান্য একখানি পায়ের কারুকাজে। কোনও দরকার ছিল না কিন্তু রায়ট লেগে থাকত ননস্টপ। পুরো কেওস-খানি সগর্ব চাউনিতে মেপে পদকর্তা ফিরে গেলেন নিজের ক্লাসে। জানেনও না, কালকের টিফিনে আবার লাগবে ধুন্ধুমার। কাঁচা আমড়া কেনার সময় দু'পাশ থেকে দু'জন অতর্কিত পুশ দেবে তাকে, ফলে সে পড়ে যাবে হজমিওলার ঘাড়ে। তার বয়ামগুলো মাটিতে পড়ে ভাঙবে সশব্দে, ঝাঁকা আঁকড়ে সে হুমড়ি খাবে হেন্দম্যান ব্লকের নীচটায়, হজমিওলা তাকে ঠাঠিয়ে দেয় একটি কানপাড়াক্কা... ঠোঁটের কষে ফেনা মুখে সে উঠে দাঁড়ায়... ঘুরে দাঁড়াতে তাকে হবেই... মায়ের-বোনের এ অপমানের (যদিও তারা কেউ সিন-এ ছিলেন না) রিভেঞ্জ তাকে নিতে হবেই... চুন চুন কে মারুঙ্গা কামিনে... রিটার্ন অফ দ্য ড্রাগন ... দু'হাত সামনে এনে সে ক্যারাটের পোজ-এ দাঁড়ায়—ইয়াঃ উঃ— একটা নানচাকু তার দরকার, বাকিটা সে বুঝে নেবে।

সত্তর দশকের সময় থেকে উঠতি বাঙালি-কিশোরের সাধের ফ্যান্টাসি ছিল নানচাকু। যেমন ট্যাঁশগরু গরু নয়, তেমনই নানচাকু চাকু নয়। দু'টি চকচকে পালিশ তেল্লা-লাঠি, একটি লোহার চেন দিয়ে জোড়া। সময়ে-অসময়ে তাই একেবারে লাগ ভেলকি লাগ। ডান হাতে আর বাঁ হাতে দুই লাঠিগাছ পাকড়ে সাঁ সাঁ করে এক-দুই চক্কর পাক খাওয়ালে, ভিলেন আপনি দৌড়বে। একটা নানচাকু দিয়ে কী না হয়? একটা গোটা পল্টনের মহড়া নেওয়া যায়। কখনও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে, কখনও চেন দিয়ে হাত লক করে—সে এক তুলকালাম কাণ্ড। বনবন বনবন ঘোরাতে হয় নানচাকু। যে যত দ্রুত ঘোরাতে পারে, সে তত বড় বীর। বাংলা চার লেখার ভঙ্গিতে ঘোরাতে হয় ও-যন্ত্র। বাঁইবাঁই করে হাওয়ায় আওয়াজ হয়। ঠিকমতো জমাতে পারলে তুমি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এবার আয়নার সামনে একবার কেবল ব্রুস লি পোজ-এ দাঁড়াও। মুখ দিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আর্ত চিৎকার দাও। নানচাকু শিক্ষার্থীরা যেমন দিয়ে থাকে। নাভির ভেতর থেকে উঠে আসা সে-চিৎকার শুনলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে। যদি কারুর হিম্মত থাকে তো পাল্টা মেরে আসুক। পা দু'টো ফাঁক করে অষ্টাবক্র পজিশন নিক। ডান হাত আর বাঁ হাত অর্ধেক খোলা জানলার মতো অপেক্ষমাণ। পায়ের হাঁটু সামান্য ভাঙা, একটি পা নাচের মুদ্রার মতো উঠে-উঠে নামছে। চোখের মণি দু'টো সাটসাট এদিক-ওদিক যাচ্ছে আসছে। নটরাজ প্রস্তুত। আও শালে ...।

ক্যারাটে আর কুং ফু। এই দুই ছিল আমাদের ক্লাসের নিরাপত্তারক্ষী। গোলাগুলি নয়, ছোরাছুরি নয়—জাস্ট দু'টি খালি হাত দিয়ে হামলা। আবহে ইঃ আঃ এঃ জাতীয় বিসর্গমূলক সাউন্ড এফেক্ট। ক্যারাটের বর্ম যে একবার পরে নেবে তাকে আর কেউ ঘাঁটাবে না। হয়তো চেহারা তার ছোট, কিন্তু কাতান-তেজে সে ঠাসা। তার সঙ্গে পাল্লা না নেওয়াই ভাল। আমাদের ক্লাসে হিমাদ্রি ছিল ছোটখাটো চেহারার, এমনিতে চুপচাপ। কে একজন তার সম্পর্কে খবর নিয়ে এল। ও কিন্তু রোজ বিকেলে পান্টোদা-র ক্যারাটে কোচিং-এ যায়। টালি ভাঙে। শেষের ইনফরমেশনটি মারাত্মক। বলে কি রে! টালি ভেঙে দেয় একদানে? উরি তারা! ক্লাসের পর আমরা সকলে ঘিরে ধরি হিমাদ্রিকে। সে খালি লাজুক হাসে। হ্যাঁরে, তুই বালিতে হাত ঢুকিয়ে রাখিস? দেখি, তোর হাতে কড়া পড়েছে কি না! সব অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর ও এড়িয়ে যেতে চায়। বলে না কিছু স্পষ্ট করে। আমাদের সমীহ বেড়ে যায় আরও। কী বেল্ট রে তুই? জামা-প্যান্ট ধরে টানাটানি করতে থাকি আমরা। হিমাদ্রি চুপ। দেখি ওর কোমরেও আমাদেরই মতো ছাল-ওঠা চামড়ার বেল্ট।

দেবাশিস দাঁ ছিল ক্লাসের সবচেয়ে স্টাইলিশ। চিনাবাজারের জ্যাকসন জুতো, অর্ধেক কানঢাকা চুল, ঠিক-বেঠিক ইংরেজি গান গুনগুন করত সর্বক্ষণ। বিভিন্ন হলিউড সিনেমার গুপ্তকথা জানত সে। গ্রেগরি পেক-এর মতো তার স্মার্ট হাবভাব। একদিন কী কুক্ষণে, দেখি, সে হিমাদ্রিকে ক্যারাটের পোজ দিচ্ছে। সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান। বেঞ্চির ওপর উঠে সে কুংফু-র কায়দায় হুম হুম ডাক দিতে লাগল। ভঙ্গিটি দক্ষিণ এশীয় হলেও, মুখে তার হিন্দি সংলাপের খই ফুটছে, হলিউড তখন অপাংক্তেয়—ম্যায় তেরা খুন পি জাউঙ্গা ... চুন চুন কে পিউঙ্গা ...। হিমাদ্রি দেখলাম, ওর চুনকাম-এ বিরাট একটা ঘাবড়ে গেল না। শক্ত পদক্ষেপে স্যারের টেবিলের ওপর উঠে ক্যাঁৎ করে একটা বাংলা লাথি কষাল। লাথিটা লাগল দেবাশিসের চোয়ালে, গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত, কোথায় কেটে পড় তা না, সে ব্যাটা দেখি হিন্দি ছবির হিরোদের কায়দায় রক্ত পুঁছে, হুঙ্কার পাড়ল ... কুত্তে। আবার খেল এক বাংলা লাথি। দাঁ আবার পোজ দেয় ছবি তোলার মতোন, ঠোঁটটা কুঁচকে বলে, কামিনে ...। তক্ষুনি ফিরতি লাথি খায়। এই সময় আমরা বুঝতে পারি, এটা ঠিক ক্যারাটে হচ্ছে না, যতটা মকশো দাঁ করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাতে ওরই বিপদের সম্ভাবনা বেশি। হিমাদ্রি লড়াইয়ের সময় কোনও স্টাইল-ফাইল মানছে না, এলোপাথাড়ি মারছে। আমরা তড়িঘড়ি ওদের ছাড়িয়ে দিই, আরও কেলেঙ্কারি ঘটবার আগে। লড়াইয়ের মঞ্চ থেকে সরে আসার পর দাঁ-এর তর্জনগর্জন আরও বেড়ে যায়। মস্ত ক্যারাটে পালোয়ানের মতো সে অদ্ভুত সব ধ্বন্যাত্মক অব্যয় মুখ দিয়ে বার করতে থাকে। দেখা গেল, আসল লড়াইয়ে সে যতটা দড়, তার চেয়েও সে বেশি ভাল চৈনিক আস্ফালনে।

সে সময় ক্লাস বনাম ক্লাস-এর গ্যাংওয়ার অমনই জোরদার হত। ক্যারাটে, জুডো, কুংফু, নানচাকু আমাদের হুঙ্কারে-অহংকারে মিশে থাকত। 'থার্টি সিক্স চেম্বার অফ সাওলিন' দেখে বাড়ির ফাঁকা ঘরে সব প্র্যাকটিস মারতাম। এক দানে পা কতটা উঠছে, তা নিয়মিত মাপতাম। 'থার্টি সিক্স চৌরঙ্গী' লেন-এর পোস্টার দেখে ভাবলাম, পার্ট টু। ধুর ধুর, লুকিয়ে মার্শাল আর্ট দেখতে গিয়ে বাড়িতে কোর্ট মার্শাল হয়ে গেল। আমার দাদাভাইয়ের গায়ের জোর ছিল দুর্দান্ত, উচ্চারণের জোর অতটা ছিল না। সে-ও সমানে শ্যাডো দিত জুডো-ক্যারাটের। তার কেরদানিতে আমরা



ভয়ানক অবাক হতে সে গম্ভীরমুখে জানিয়েছিল—এই লেশন সে শিখেছে 'ফুচকা ও ফুলুরি' নামক একটা সিনেমা থেকে। আমরা তো সকলে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম এমনতর নিরামিষ নামের একটি ছবির কথা শুনে, যেখানে এইসব দুর্লভ ভঙ্গিমার বুলবুলভাজা পাওয়া যায়। পরে তদন্তে জানা গেল, ছবিটি বাংলা নয়, নামও ঠিক 'ফুচকা ও ফুলুরি' নয়—'ফিস্ট অফ ফিউরি'। বুই লি বলে একটা লোক আছে বুইলি, সে যা ঝাড় দেবে না—হেব্বি। সেই প্রথম ব্রুস লি-র নাম শুনলাম। দ্য বিগ বস। যত দেখবে তত রস। প্রতি ছবির শেষে যে পেঁদিয়ে বেন্দাবন দেখিয়ে দেয়। আমরাও টকি শো হাউস-এ ও-জিনিস দেখে রাত্রে ঘুমের মধ্যে আর্ত চিৎকার দিই। পরিবারের লোকজন সন্ত্রস্ত বোধ করতে শুরু করে। সিনেমাটি বাড়ির চিনেমাটির বাসনের সর্বনাশ করে।

'এন্টার দ্য ড্রাগন' দেখেছি অনেক পরে। তার আগে প্রথম নানচাকু দেখি 'কালকূট' নামে এক বাংলা সিনেমায়। নায়ক ছিলেন ব্রুস লি-র এক ক্রোনতুতো ভাই। নাম—অর্ধেন্দু বোস। সম্পর্কে নেতাজির কে যেন একটা হতেন। বম্বে ডাইং-এর বিজ্ঞাপনে তাঁকে দেখা যেত। সামান্য ল্যাপাপোঁছা দেখতে ছিলেন, ফলে ব্রুস লি-র চরিত্রে ঠিকঠাক মানিয়ে গিয়েছিল। নানচাকু নিয়ে তিনি মহড়াও দিয়েছিলেন চমৎকার, শনশন বাঁইবাঁই। ঘুরপাক দেখলে কে বলবে এ বাঙালি! তখন সিনেমা মানেই অ্যাকশন। আর অ্যাকশন মানে দ্য গ্রেট ব্রুস লি।

আসলি ব্রুস লি আমাদের কাছে ছিলেন রূপকথার নায়ক। তাঁর জীবনের সব কিছু আমরা দারুণ সত্যি জানতাম। চৈতন্যদেবের মৃত্যু যেমন রহস্যে মোড়া, ব্রুস লি-রও তাই। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে কোন মাফিয়ারা যে তাঁর জীবন ছিনিয়ে নিল! সম্মুখসমরে তো তাঁকে বধ করা যেত না, তাই লুকিয়ে-চুরিয়ে মারতে হল—অকালমৃত্যু আমাদের কাছে কিংবদন্তি করে দিয়ে গেল ব্রুস লি-কে, ভক্তবৃন্দের কাছে তিনি রেখে গেলেন তাঁর সাধের অভিজ্ঞানখানি। নানচাকু।

সত্যি-সত্যি ব্রুস লি-র জীবন কেমন ছিল? কতখানি ঝড়ঝঞ্ঝা, ঝকমারিতে মোড়া ছিল তা? ১৯৪০-এর ২৭ নভেম্বর জন্মেছিলেন তিনি, আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো শহরের চায়না টাউন-এ। চিনা দম্পতি তাঁদের খোকার নাম রাখেন লি জুন ফন। অমন মার্কিনি 'ব্রুস', খুব সম্ভবত, হসপিটালের কেউ দিয়েছিল। বাবা ছিলেন ক্যানটোনিজ অপেরা-র নামকরা অভিনেতা। ঠিক যে সময় জাপানি সৈন্যরা হংকং-এর দখল নিচ্ছে, সেই সময় ব্রুস লি জন্মাচ্ছেন পৃথিবীর অপর এক প্রান্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝাপট তখন প্রবলভাবে আছড়ে পড়ছে হংকং-এর ওপর—এমন একটা

সময় ব্রুস লি-কে নিয়ে বাবা-মা ফিরে এলেন নিজেদের ভূখণ্ডে। হংকং-এই ব্রুস শিখতে শুরু করলেন মার্শাল আর্ট। বিশ্বখ্যাত যে স্টাইলটির নাম—উইং চান।

হাই স্কুল বক্সিং চ্যাম্পিয়ন ব্রুস কিন্তু পাড়ার লড়াইতে কিছু কম যেতেন না। প্রতিদিনই জড়িয়ে পড়তেন একটা-না-একটা গণ্ডগোলে, পুলিশ এসে বাবা-মা'কে এই বলে শাসিয়ে যেত, পরের লড়াইটায় নিশ্চিত জেল হবে ব্রুস-এর। ফলে হংকং থেকে ব্রুস-কে না-সরিয়ে কোনও উপায় ছিল না তাদের।

ডুয়াল সিটিজেনশিপ-এর সুবিধে ছিল, পকেটে একশো ডলার গুঁজে ব্রুস লি পাড়ি দেন সান ফ্রান্সিসকো। প্রচুর কাঠ-খড়-হাত পুড়িয়ে শেষমেশ মার্শাল আর্ট শেখানোর স্কুল খুলে বসেন সিয়াটেল-এ। কুং ফু, উইং চান—সবরকম ঘ্যাঁট পাকিয়ে ব্রুস নিজের স্টাইল তৈরি করেন—'জিত কুন ডো'। এখনও বাংলাবাজারে যে ক্যারাটে, কুং ফু শেখানো হয়, তার অধিকাংশই এই 'জিত কুন ডো' স্টাইল। মার্শাল আর্ট শেখানোর পাশাপাশি ব্রুস লি অনেক টেলিভিশন প্রোগ্রাম করেছিলেন, ভবিষ্যতের সিনেমাগুলোর বীজ বোনা ছিল সেখানেই।

ব্রুস লি-র জীবদ্দশায়, তিনি সত্যিকারের হিরো ছিলেন হংকং-এর। আমেরিকায় তিনি তখনও কল্কে পাননি। সবসময়ই তাঁকে সেকেন্ড-থার্ড গ্রেড শিল্পীর চোখে দেখা হয়েছে। যদিও মৃত্যুর পর ব্রুস লি-কে ঘিরে নানা গল্পকথা, রহস্য বুদবুদ, তাঁকে শহিদের মর্যাদা দিয়েছে পৃথিবী জুড়ে। আদতে তাঁর সব ক'টি সিনেমাই চিনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলে। জাপ-শাসনে জর্জরিত শৈশব কেটেছে তাঁর হংকং-এ, পরে রাজনীতির পটবদল ঘটেছে অনেকটাই, কিন্তু তবুও ব্রুস লড়ে চলেন তাঁর ছোটবেলার জাপানি ভিলেনদের বিরুদ্ধেই। সে পীত-সন্ত্রাসের সাম্রাজ্যে তিনিই সকলের রক্ষাকর্তা। এই রাজনীতি, এই লড়াই আমেরিকা বুঝতে পারে না, কিন্তু চিন-হংকং সাদরে কাছে টেনে নেয় তাঁকে। তাই প্রাথমিকভাবে ব্রুস লি এশিয়ার হিরো, অনেক পরে সে বাকি পৃথিবীর।

ব্রুস লি-কে ঘিরে সারা পৃথিবীর মাতামাতির পুরোটাই তাঁর রহস্য-মৃত্যুর পর। মৃত্যুর বছরেই মুক্তি পায় 'এন্টার দ্য ড্রাগন'—বক্স অফিস নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে। এরও পাঁচ বছর পর—'দ্য গেম অফ ডেথ'—সেটিও সুপার-ডুপার। তখন মার্কিনি ওয়াল মার্ট-এ চে গুয়েভারা-র মুখ আঁকা টি-শার্ট-এর পাশেই সার বেঁধে ব্রুস লি, খালি গা, হাতে নানচাকু। সারা বিশ্ব স্বীকার করে নিল এই নতুন আইকন-কে। এককথায়। 'এন্টার দ্য ড্রাগন'-এর শেষ চমকপ্রদ দৃশ্যটি যেমন। কাচের ঘরের মধ্যে লড়ছে ব্রুস লি। অন্যদিকে বাঘ নখ হাতে ড্রাগন। কোনটা আসল আর কোনটা অবয়ব—চেনা যাচ্ছে না মোটে, এক ব্রুসলি হাজার থেকে লক্ষ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেন একটু-একটু করে...নিরুত্তাপ সে-ভঙ্গিতে বিজয়ের পাঞ্জা আঁকা সবসময়। কপালে প্রাচ্যের জয়টীকা, লড়কে লেঙ্গে ইংলিশস্তান।

মৃত্যু তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। আরও সুমহান উচ্চতায় তুলে নিয়ে গিয়েছে। একই কথা তাঁর পুত্র ব্র্যান্ডন লি-এর ক্ষেত্রেও সত্য। কোন পারিবারিক অভিশাপে মাত্র আঠাশ বছর বয়সে তিনি-ও মারা যান কে জানে! 'দ্য ক্রো' নামের একটি ছবির শুটিং করছিলেন ব্রুস ও লিন্ডার সন্তান। হঠাৎ করেই মারা যান। তাঁকে কবর দেওয়া হয় বাবার পাশেই। 'গেম অফ ডেথ' নামটা যেন দু'জনের পক্ষেই বড় বেশি অর্থবহ। সেই অপার রহস্যময়তায় মোড়া রইলেন পিতা-পুত্র, যা আরও রূপকথা তৈরি করে, জন্ম দেয় শত-শত হাজার হাজার ব্রুস লি-র। কাতান, কাতো, জিত কুন জো, নান চাকু, পেনচাকু, ব্লিডার, গ্লো-চাক্স—কত অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দগুচ্ছ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। ব্রুস লি-র ব্যাটন হাতে তুলে নেয় কোন্নগরের বালিকা, হারিয়ে যেতে দেয় না তাঁর লড়াইকে। গরম বালির মধ্যে চোবানো দু'হাত খুঁজে চলে সে গুপ্তধন। আরেবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই, জালিয়াতের ওপর যেন কথা বলতে পারে খালি হাত।



আমার ছোটবেলায় একটা কালো রং-এর বেল্ট ছিল। ওটাকেই ব্ল্যাক বেল্ট মনে করে কতবার বিছানা ধামসেছি। সত্যিকারের নানচাকু তো ছিল না; কিন্তু ব্রুস লি-র ছবিটা মনে ছিল। ফলে স্কিপিং-এর দড়িটাকে ছোট করে ওটাকেই বানিয়ে নিতাম নানচাকু। আয়নার সামনে বাদ বাকি কাপ্তানি। কোন স্যর ভীষণ অপমানে কান মুলে দিচ্ছেন, কোন পাড়ার দাদা ব্যাট কেড়ে নিল মাঝ ইনিংসে, কোন বন্ধু ডটপেন ঝাঁকিয়ে দিল পিঠের ওপর—সব দগদগে ক্ষতের ওপর নকল নানচাকু নিয়ে আমি রুখে দাঁড়াতাম। বাড়িতে হাসত। সত্যি সত্যি পারে না, এর যত রোয়াবি শুধু বাড়িতে। মনখারাপ হলে সব ঢিসুম-ঢিসুম উগরে দিতাম বারান্দায় রেলিং-এ। পোস্টারের সামনে হাত জোড় করে বলতাম, ভগবান ব্রুস লি, আমায় তোমার মতো করে দাও, প্লিজ।



আমিও যেন একবার ওই হতছাড়া হাভাতে হার্মাদগুলোর মুখের ওপর পা তুলতে পারি, আঙুল ঢুকিয়ে দিতে পারি ছ্যাঁচড়া শয়তানগুলোর চোখে। একটা নানচাকু ভীষণভাবে দরকার বি-সেকশনের সঙ্গে লড়াইয়ে। একবার শক্তি দাও, মা কালীর দিব্যি, আর চাইব না কিছু কোনওদিন।

ব্রুস লি নানচাকু দেননি। অন্য কোনও বর—তা-ও না। প্রতিটি লড়াইয়ে যেমনটা ভেবেছিলাম, তেমন মোটেই হয়নি—গোহারান হেরেছি। বড় হওয়ার পর দেখি আরও বিপদ। এ লড়াইগুলো আরও জটিল, খটমট। 'জিত কুন ডো' এক্সপার্ট হয়ে কোনও লাভই হচ্ছে না। অন্য-অন্য দিক থেকে মেরে দিচ্ছে সময়। হাত ওঠানোর, পা চালানোর সময় পর্যন্ত মিলছে না। নানচাকু পাকড়ে আমি বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাই, কোনদিকে থেকে অ্যাটাক আসছে...চেষ্টা করি মাথার পিছনে আরও দু'টো চোখ গজিয়ে নেওয়ার...যেন দেখতে পাই কারা ছুরি চালাচ্ছে...

একপাক সামনে ঘুরে স্মার্ট ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াই... যাতে তেজিয়ান চেহারা দেখে কেউ কেউ চমকায়... ফালতু ফালতু চিৎকার ছাড়ি, যাতে রক্ত জল হয়ে যায় অদৃশ্য শত্রুদের... এক পা তুলে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করি বাকি শরীরের... শক্ত চোয়াল আর জেদি চোখে পড়ে ফেলার চেষ্টা করি সব দেওয়াল-লিখন... ঝটিতি দেখে নিই কোন অনুসরণকারী আজ আমার পিছনে...আর সমস্ত আস্ফালন-অন্তে আমি হাতড়ে বেড়াই শূন্য থেকে শূন্যে, অবসন্ন বসি দিনান্তের রোদে, নানচাকু নামিয়ে রাখি ঘাসে... ধুস্‌স মা কালী... রেখেছো বাঙালি করে ব্রুস লি করোনি...।

চেনা, আধচেনা মানুষের মুখ, মুখের মিছিল

ঘোড়াবাবুর সঙ্গে ঘোড়ার কোনও সম্পর্কই ছিল না। ঘোড়াবাবুর দিকদিগন্তে কোথাও ঘোড়ার কোনও চিহ্ন নেই। ছোট টাউনে একটা দু'টো ঘোড়ার গাড়ি ছিল বটে, সে কেবল বর নিয়ে পাশের গ্রামে রওনা হওয়ার জন্য। সামনে ব্যান্ডপার্টি পিছনে রিকশার সারি, দু'জন করে একটা রিকশায়। এই শোভাযাত্রায় ঘোড়ার গাড়ি থাকত মাঝখানে। কিন্তু ঘোড়াবাবুর বিয়ের বরযাত্রীতে এসব হয়েছিল কি না কেউ জানে না। অন্তত আমি জানি না। ঘোড়াবাবু রেস খেলতেন না। ধুতি আর কলার দেওয়া শার্ট পরতেন। আর বসে থাকতেন একটা দোকানে। দোকানটা ঘোড়াবাবুরই নিজের। সেখানে বোয়ামে লজেন্স বিস্কুট চকলেট ইরেজার পেনসিল কলম রং পেনসিল পাঁউরুটি জেলি জ্যাম পলসন মাখন 'জ্ঞানের আলো' নামক শিক্ষামূলক খেলনা পর্যন্ত সব পাওয়া যেত। দোকানের নাম শোভা স্টোর্স। অন্য সব মনিহারি দোকানের সঙ্গে শোভা স্টোর্সের একটাই তফাত। শোভা স্টোর্সে থাকত বড় একটা টেলিরাড রেডিও। অন্য দোকানে তা থাকত না। টেলিরাড রেডিও এখন উঠে গিয়েছে নিশ্চয়। বড় বড় পিয়ানো বাটন সামনে। আর রেডিও-র মাথা-বুক জুড়ে যেখানে স্পিকার থাকে, সে জায়গাটা কাপড়মোড়া। ফলে গমগম একটা আওয়াজ বেরোয়। সকাল সাড়ে ছ'টায় ইস্কুলে ঢুকছি। এখনই শোভা স্টোর্স খোলা। টেলিরাড রেডিও-ও। ঝড়ের বেগে গানের আওয়াজ বেরিয়ে এসে, প্রথম সকালের রোদ্দুর বিছানো সরু রাস্তায় পড়ছে। ঠিক গান নয়। আ-আ-আ...এইভাবে কাটা কাটা আওয়াজ। কিন্তু সুর ভরা আওয়াজ। কোনও কথা নেই তাতে, বা থাকলেও বোঝা যাচ্ছে না। জড়ানো। পৌনে সাতটায় ক্লাস শুরু। পেনসিল-লজেন্স কিনছি। নীরব মুখে বোয়াম খুলে লজেন্স বার করছেন ঘোড়াবাবু। একটা গান শেষ হল। পয়সা দিচ্ছি লজেন্সের। দ্বিতীয় গানের অ্যানাউন্সমেন্ট হল। সুবন্ধ সংগীত অনুষ্ঠানে আপনারা খেয়াল শুনছেন বড়ে গোলাম আলির কণ্ঠে। এরপরের রাগ দেশি টোড়ি। স্কুলে চলে এলাম। সাড়ে আটটায় টিফিন। বেরিয়ে আবার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে শোভা স্টোর্স। এবার আমি এদিকে কিনছি একপিস প্লাম কেক। ওদিকে রেডিও থেকে গমগমে আওয়াজ কোনও তারের যন্ত্রের। ঝ্যাঁ-আ-আ-ও! ঝ্যাঁ-আ-আ-ও। ঝ্যাঁ-আউঁউঁউঁউঁ! একটা ধাক্কা দিয়ে, চলে গেল অনেকটা। যেন ভেসে যাচ্ছে আওয়াজটা। আমি কৌতূহল চাপতে পারলাম না। জিগ্যেস করলাম, এটা কী বাজছে? উনি বললেন, ভৈঁরো। মানে ভৈরব। ভাবলাম, ভৈরব তবে একটা বাজনার নাম। থ্রি-তে পড়ি তখন আর কী বুঝব। কিন্তু বাজনাই হোক আর যা-ই হোক, ভৈঁরো কথাটা প্রথম শুনলাম ঘোড়াবাবুর মুখে।

ঘোড়াবাবুর মুখ ছিল অসম্ভব নির্বিকার ও গম্ভীর। তিনি রেগে না থাকলেও মনে হত সারাক্ষণ রেগে আছেন। তাঁকে রাগ করতে কোনওদিন দেখিনি। তাঁকে হাসতে কোনওদিন দেখিনি। মুখটা খুব ভারী। দাড়িগোঁফ কামানো। একেবারে কপাল থেকে শুরু হয়েছে চুল। সবসময় পিছনের দিকে চাপ-চাপ করে আঁচড়ানো। চিবুক ছোট। নাক ভোঁতার দিকে। দোকানের সামনে দাঁড়ালে চোখে একটা 'কী চাই' ফুটে ওঠে। কোনও জিনিস আছে কি না জিগ্যেস করলে দু'টো ব্যাপার বলেন। এক, আছে। দুই, আট আনা। বা দশ আনা। বড়জোর পাঁচ সিকে। এছাড়া একটাও বাড়তি কথা বলেন না। শুধু আমাদের মতো ছোটদের সঙ্গে বলে নয়। ওঁরই মতন বড়দের কারও সঙ্গেও কখনও খুব গল্প করছেন ঘোড়াবাবু, এমন দেখা যায় না।

ফাইভে উঠেছি। দুপুর একটা কুড়িতে টিফিন ঘণ্টা বাজল। রাস্তায় আসতে ওইরকম পাঁচ-সাত মিনিট। এবার লক্ষ্য, শোভা স্টোর্স নয়। তার ঠিক পাশের সিঙাড়া-কচুরির দোকান। শোভা স্টোর্সে দু'জন কর্মচারী হাতে করে পাল্লা লাগিয়ে বন্ধ করছে দোকান। ঘোড়াবাবু রাস্তার দিকে পিছন করে পিছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওইরকম কথাহারা আ-আ-আ আওয়াজ দ্রুত বেগে আসছে ভিতর থেকে—সঙ্গে খুব তবলা বাজছে। তখনই থামল। শোনা গেল, এতক্ষণ আপনাদের কুকুভ বিলাবল রাগে খেয়াল গেয়ে শোনালেন এম আর গৌতম। টকাস করে বন্ধ হয়ে গেল টেলিরাড রেডিও। শোভা স্টোর্সের পাশে দাঁড়িয়ে যখন সদ্য কেনা সিঙাড়ায় কামড় বসাচ্ছি, তখন হাতে একটা ছাতা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছেন ঘোড়াবাবু। গানটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন বোঝাই যায়। হাঁটা লাগালেন বাড়ির দিকে। ছ'টা থেকে দেড়টা দোকানে বসেছেন। এবার দুপুরে বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করবেন। আসবেন আবার বিকেলে।

পানের দোকানে যেমন অষ্টপ্রহর রেডিও বাজে ঘোড়াবাবুর দোকানে তেমন বাজত না। এমন ধরনের গানই বাজত, যার কথা বোঝা যায় না। এছাড়া বাজনাও বাজত। ঘোড়াবাবু চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন। মৃদুগম্ভীর গলায় কর্মচারীদের এটা-ওটা বলতেন হাসিহীন মুখে। একদিন মায়ের সঙ্গে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি, রাত সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। সকালের জন্য পাঁউরুটি নিতে মা রিকশা ঘুরিয়ে আনল শোভা স্টোর্সের সামনে। কিন্তু রিকশাওয়ালা বলে, দোকান তো বন্ধ দিদিমণি। দোকান বন্ধ? হ্যাঁ, দোকান বন্ধই, কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। সবচেয়ে বড় কথা, দোকানের ভেতর থেকে টুংটাং বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। মা নামল রিকশা থেকে। বলল, দরজায় নক কর তো। ভাই প্রতিবাদ করে। সে ধাক্কা দেবে দরজায়। মা বুঝল, ভাই দুমদাম কিল মেরে অনর্থ করবে। বলল, তুমি না। বাবু ডাকো। আমি দরজার সামনে গিয়ে ঘোড়াকাকা, ঘোড়াকাকা করতে লাগলাম। আর বন্ধ দরজায় যথাসাধ্য আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলাম।

ঘড়াৎ করে আওয়াজ। ভ্রু কুঁচকোনো মুখ বেরোল। পিছনে মাকে দেখে সমান হল ভুরু-কপাল। আপনি, দিদিমণি? কী দেব বলুন। দু'টো গ্রেট ইস্টার্ন দিন। এনে দিলেন। কিন্তু হাসি নেই মুখে। মা কুণ্ঠিতভাবে বলল, আপনাকে বিরক্ত করলাম হয়তো, আসলে শীতের রাত, আর কোথাও খোলা পাব না এখন। সেই স্টেশনে যেতে হবে। ঘোড়াবাবু বললেন, আমিও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ মুস্তাক আলি খাঁ সাহেবের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে, তাই ওদের বললাম বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে যাও। বাজনা শেষ হলে বাড়ি যাব।

মা দ্রুত লজ্জিত পায়ে আমাকে নিয়ে ফিরে রিকশায় উঠল। পাল্লাটা আর আটকালেন না ঘোড়াবাবু। রিকশা তিনজনকে নিয়ে চলছে, তাই আস্তে। পিছনে তাকিয়ে দেখি অন্ধকার রাস্তায় সরু একফালি আলো আর বাজনা বেরিয়ে আসছে।

তখন সিক্স-এ পড়ি। একটু সাহস হয়েছে। পরদিন টিফিনবেলায় শোভা স্টোর্সে গিয়ে কেক চাইতে ঘোড়াবাবু যখন বোয়ামে হাত ঢোকাচ্ছেন—জিগ্যেস করলাম, কাল রেডিওতে বাজনাটা কে বাজাচ্ছিল? বাজাচ্ছিল নয়। বাজাচ্ছিলেন। ঘোড়াবাবুর মুখটা প্রসন্নও নয়, অপ্রসন্নও নয়। আমি থতমত খেয়ে বললাম, উনি কে? একজন সেতারি! মস্ত বড়। আমার পয়সা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, কেক হাতে চলে আসছি, শুনলাম, দাঁড়াও। ঘুরলাম। বকবে নিশ্চয়। মা তো কতবার বলেছে বড়দের করছিল, যাচ্ছিল বলতে নেই। করছিলেন, যাচ্ছিলেন বলতে হয়। ঘোড়াবাবুর হাতে একটা বই। বাড়িতে যে 'শুকতারা' আসে, তারচেয়ে বড় আর চকচকে মতো। ওপরে লেখা বেতার জগৎ। এই যে, ইনি। প্রথম পাতাটা খুলতেই ভিতরের মলাটে একটা বড় ছবি। চশমা চোখে এক ভদ্রলোক। পাঞ্জাবি পরেছেন। হাতে একটা বড় যন্ত্র। যন্ত্রটার



নীচের দিকটা গোল একটা কলসির মতো। মাঝখান দিয়ে কাটা কলসি। আবার যন্ত্রটার মাথার দিকেও অনেকটা ছোট একটা গোলাকার জিনিস লাগানো। অনেকটা আমার ছোট মামিমার বড় খোঁপার মতো। তারচেয়ে একটু বড়ই হবে। ছোটমামিমার মাথায় অনেক চুল। তার খোঁপাও বিখ্যাত। সবাই আলোচনা করে। ওই আদ্ধেক কলসি মতো জায়গাটা ভদ্রলোকের হাঁটু পার হয়ে নেমেছে। মধ্যে একটা চওড়া পালিশ করা কাঠ—সেখানে বহু তার লাগানো। এটাকে কী বলে? ঘোড়াবাবু বললেন, এই হল সেতার। আর যিনি বাজাচ্ছেন, ওই যে কাল বলেছি, মুস্তাক আলি খাঁ সাহেব। সেতারি। যাও, ঘণ্টা পড়ে যাবে।

ফিরছি। সে-তার? এ জিনিস তো আগে আমি দেখেছি। তবে বন্ধুরা ফিল্ডিং করতে ডাকতে এল বলে ভালভাবে লক্ষ করতে পারিনি। এ জিনিসটা দেখেছি বরার বাবার হাতে। বরা আমাদের সঙ্গে পড়ে। আমাদের সঙ্গে খেলে। বরাদের বাড়ি অনেক গাছপালা আর মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গায় আমরা ম্যাচ খেলি। পাঁচিলে গড়িয়ে লাগলে দুই। এক ড্রপে চার। গাছপালার ভেতরে বরাদের বাড়িটা ঢাকা থাকে। উঠোনে গিয়ে জল খাই টিউকল থেকে। সাতজনে-সাতজনে ম্যাচ। বরাদের মাঠে যখন ম্যাচ খেলছি কাম্বিস বলে, তখন টুংটাং কীসের যেন আওয়াজ আসছে একদিন। তার আগেই ব্যাঁকাদার ভাইপো বুড়ো আমায় ওভারের চার নম্বর বলে আউট করে দিয়েছে এক রানে। সেটা প্রথম ওভার। আমি প্রথম ব্যাটসম্যান। এক রান করলাম কী করে? বরাদের মাঠে নিয়ম ছিল, কোনও বোলার নো বল করলে, যে ব্যাট করছে সে-ই রানটা পাবে। বুড়োকে একটা নো ডেকেছিল আম্পায়ার। সেই এক রানে আউট হয়ে আমি আনমনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বাজনার সোর্সটা খুঁজতে লাগলাম। দেখি, একটা ঢাকামতো বারান্দায় বসে বরার বাবা কী একটা যন্ত্র বাজাচ্ছেন। যন্ত্রটা ঠিক ওই ঘোড়াবাবুর দেখানো ছবিরই মতো। আর বাজাতে বাজাতে একা একাই হাসছেন। হাসতে হাসতেই আমাকে দেখলেন বরার বাবা। একটুও চমকালেন না। বললেন, শুনবে? বোসো। শোনো। মালগুঞ্জি। আমি ভাবলাম, উনি যে যন্ত্রটা বাজাচ্ছেন তার নাম মালগুঞ্জি। শুনব কী! বরার ছোট ভাই এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। নালিশ করল বরাকে, ফিল্ডিং খাটবে না বলে বাবার ঘরে লুকিয়ে বসেছিল। আমি প্রতিবাদ করি। না না, মোটেই লুকোইনি। উনি মালগুঞ্জি বাজাচ্ছিলেন, আমি শুনছিলাম। বরার বড়দি একটা মোড়া পেতে মাঠের ধারে বসে চুল খুলে রোদ পোয়াচ্ছিল। দু'মাস আগে সে সংগীত প্রভাকর পাস দিয়েছে। সে চোখ কপালে তুলে মোড়া ছেড়ে ছুটে এল। বলিস কী! তুই এত জানিস! সে কী রে! এত বুঝিস! আই তোরা ওকে কিচ্ছু বলবি না। ঠ্যাং ভেঙে দেব ওকে কিছু বললে। আমি পার পেয়ে গেলাম।

তা হলে ওটার নাম মালগুঞ্জি নয়। ওটার নাম সেতার? তা হলে মালগুঞ্জি কী?

এর চল্লিশ বছর পর, কলকাতায় গড়িয়ার একটা বাড়ির একতলায় থাকি। জানলার নীচেই সরু রাস্তা আর রাস্তার পরে মাঠ। ভোর ঘুমে একদিন অর্ধেক জেগেছি। কানে এল : উজল কাজল দু'টি...নয়ন তারা...উ-জ-অ-ল, কা-আ-জ-ল দু'টি......পাগলের মতো বিছানা ছেড়ে রাস্তার দিকের জানলা খুললাম। দূরে কয়েকজন মর্নিং ওয়াক করে রোজ। আজ কেউ নেই। শুধু মাফলার জড়ানো শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ এই গানটা গাইতে গাইতে আমার দৃষ্টি এইমাত্র পার হলেন। গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে, ছুটে, ঘুরে পিছনের রাস্তায় পৌঁছে দেখি শুধু হালকা কুয়াশামাখা সকালের রোদ। সেই শুভ্রকেশ বৃদ্ধের মুখ কোনওদিনই দেখা হয়নি। কানে শোনা ওই সুরটুকুই তাঁর মুখ।

ঘোড়াবাবুর বাড়ি এক মন্দিরের সামনে। বাড়ির দোতলাটা পুরোটাই ছাদ। সেই ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে ঘোড়াবাবুর মেয়ে। সকলকে দেখেই হাসে। চেনা-অচেনা সকলকে। বয়স ২৫ থেকে ৩৫। স্কুলে যায়নি কখনও। অনেকদিন পরে, অপর্ণা সেনের 'পারমিতার একদিন' সিনেমাটি দেখবার সময় সোহিনী হালদার অভিনীত চরিত্রটি দেখে আমার ওই মেয়েটির কথা মনে পড়েছিল। অবিকল ওই। বাবার দোকানে সে আসে মাঝে মাঝে। ছোটখাটো জিনিস নিয়ে বাড়ি যায়। দোকানের কাছেই বাড়ি। এছাড়া সে আরেকটা সময় বেরোয়। বাড়ির সামনে মন্দিরে মাঝে মাঝেই সদ্যবিবাহিত দম্পতি রিকশা করে প্রণাম করতে আসে। চারপাশের বাড়ি থেকে নানা বয়সের মেয়ে-মহিলারা ছুটে আসে। তখন আলুথালু শাড়িজামায় দৌড়ে আসে সেই মেয়ে। মা এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যান।

বয়স বাড়ল আমার। তিরিশ-বত্রিশে পৌঁছলাম। তখন ঘোড়াবাবু আর দোকানে বসেন না। বিকেলে প্ল্যাটফর্মে বা নদীর ধারে একটু পায়চারি করেন। অন্য বৃদ্ধদের সঙ্গে গল্পও করেন না। একা তো একাই। বড়ছেলে দোকান চালায়। তবে এর মধ্যে আমি ঘোড়াবাবুর অন্য একটি পরিচয় আবিষ্কার করেছি। আমি তখন রাত দশটা-এগারোটায় রাস্তায় বেরিয়ে ছোট্ট টাউনের নির্জন গলিতে গলিতে সারা রাত ঘুরে বেড়াই। একদিন সরু রাস্তা থেকে তাকালাম। সামনেই কোলাপসিব্‌ল গেট, তারপর বারান্দা। সেখানে ঘোড়াবাবু চোখ বন্ধ করে গাইছেন : ক্যায়সে-এ সু-উ-খ সোওওয়ে। বেহাগ। বিলম্বিত।

পাশে ওই অল্পবুদ্ধি প্রায়-হাবা মেয়েই হারমোনিয়ম ধরে বসে আছে। না, মেয়েটির হাত খেলছে না হারমোনিয়মের রিডের ওপর। সে দু'টি আঙুল দিয়ে সা পা সা টিপে রেখেছে আর বেলো করে যাচ্ছে। বিরাট একটা ম্যাক্সি পরে আছে। তার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে কবেই। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে অন্যমনস্কের মতো। মাঝে মাঝে একটা হাত তুলে অন্য হাতের মশা মারছে। মাঝে মাঝে আপনমনে হাসছে। সে বাবার গান শুনছে না একটুও। তার বাবা মাদুরে বসে একটি হাতে মেঝেতে ভর রেখেছেন, অন্য হাতে সুরটাকে ধরে ধরে যেন খেলাচ্ছেন। মেয়েকে শোনাচ্ছেন না তো বটেই। একদিন বেহাগ শুনেছিলাম। আর একদিন শুনি মোরি পিয়া না পুছে কুছ বাত...এইটা নিয়েই খেলছেন। তারপর মুখে এলেন কউনা গথ ভৈ! বাগেশ্রী। আর একদিন শুনেছিলাম ইয়ে করিম নাম তেরো। মিঞামল্লার। সবই ওই বিলম্বিত। গাইছেন। কাউকে শোনাচ্ছেন না। আর যে সংগত করছে—সেও শুনছে না। কিন্তু গান চলছে। দু'জনে দু'রকম মন নিয়ে বসে আছে, বাবা আর মেয়ে। আর নিঝুম রাত্রির গলিতে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি, আর দেখছি সুর নিয়ে খেলতে খেলতে ঘোড়াবাবুর ওই সম্পূর্ণ ভাবচিহ্নহারা মুখে কত সকালরোদ, কত বিকেলআলো, কত ফাগুনজ্যোৎস্না, কত বর্ষারাত্রির আভাস! কত রং!

রোববারের মেগা

ক্ষমা করো হে প্রভু

রূপক সাহা

টিভিতে খবর শুনতে শুনতে সুশোভনদার চিঠিটা পড়ে ফেলে জয়দেব। চিঠিতে লেখা মহাপ্রভুর ছবি সংক্রান্ত নানান তথ্য। হঠাৎ খবরে দেখায়, গতকাল রাতে শর্ট সার্কিট থেকে তার প্রকাশনা সংস্থায় আগুন লেগেছে। কলেজ স্ট্রিট যাবে বলে উঠে দাঁড়াতেই ফোন বেজে ওঠে ল্যান্ডলাইনে...।

৬

সকালবেলায় হোটেলে ফিরে, টিভি চালিয়ে পুরন্দর দেখল, খবরটা দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করে ও জানিয়ে দিল, 'প্রথম কাজটা হয়ে গিয়েছে। কোনও ঝামেলা ফেস করতে হয়নি। এবার আমায় কী করতে হবে?'

ওপ্রান্ত থেকে উত্তর এল, 'অন্য কোনও হোটেলে চলে যা। পরিস্থিতিটা কী দাঁড়ায়, ভাল করে অবজার্ভ কর। আজ রাতেই কিন্তু তোকে দু'নম্বর কাজটা সেরে ফেলতে হবে।'

'খবরটা টিভিতে দেখাচ্ছে।'

'ও নিয়ে মাথা ঘামাস না। তোর কাজ তুই করে যা।'

'হাতের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কিছু টাকা পেলে ভাল হত।'

'দুপুর বারোটার সময় কোলে মার্কেটে যাবি। পোস্টাপিসের সামনে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকবি। যে লোকটা টাকা নিয়ে যাবে, তার হাতে থাকবে গেরুয়া রুমাল। কোড—সোনার গৌরাঙ্গ।'

'ঠিক আছে।'

কথাটা বলেই পুরন্দর লাইন কেটে দিল। প্রয়োজনের বেশি একটা কথা বলার অধিকার ওর নেই। হেড কোয়ার্টার্সে পূজ্যপাদরা তা হলে চটে যাবেন। এমনিতে জিভের আড়ষ্টতার জন্য পরিষ্কারভাবে ও কথা বলতে পারে না। মাঝেমধ্যে ওর কথা আটকে যায়। এই কারণে লজ্জায় পুরন্দর মুখ খোলে খুব কম জায়গায়। কিন্তু সুপুরুষ আর সাহসী বলে ওকেই কঠিন কাজের জন্য সব জায়গায় পাঠানো হয়। পুরন্দরকে পছন্দ করার আরেকটা কারণ, ও ওড়িয়া, হিন্দি আর বাংলা—তিনটে ভাষায় কথা বলতে এবং লিখতে-পড়তে পারে। কলকাতায় একটা সময় অনেকদিন কাটিয়েছে। রাস্তাঘাট ভালমতো চেনে। কাজের সূত্রে, এখনও পুরন্দর কলকাতায় মাসে দু'তিনবার আসেই।

হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে কথা বলেই পুরন্দর মোবাইল সেট থেকে সিমকার্ডটা খুলে ফেলল। তারপর যত্ন করে অন্য একটা সিমকার্ড লাগিয়ে নিল। হেড কোয়ার্টার্স থেকে ওকে চার-চারটে সিমকার্ড দেওয়া হয়েছে। বারবার কার্ড পাল্টে ও ওপরওয়ালাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। মোবাইল সেট টেবিলের ওপর রেখে, জুতো খুলে পুরন্দর সোফায় গা এলিয়ে দিল। রাতে এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি। কাল অনেক রাতে কাজ শেষ করার পর, কলেজ স্ট্রিট থেকে হাঁটতে হাঁটতে ও শিয়ালদা স্টেশনে গিয়েছিল। চায়নি, রাতে হোটেলে ফিরে রিসেপশনিস্টের নজরে পড়ুক। ভোর পর্যন্ত পুরন্দর ঘাপটি মেরে প্ল্যাটফর্মেই শুয়েছিল। ভোরে হোটেলে ফিরেছে এমনভাব দেখিয়ে, যেন মর্নিং ওয়াক করতে গিয়েছিল।

শিয়ালদার এই হোটেলে দু'দিন ধরে রয়েছে পুরন্দর। তার আগের দু'দিন ও ছিল বাগমারি রোডের এক হোটেলে। হেড কোয়ার্টার্স থেকে ওকে বলেই দেওয়া হয়েছে, কোথাও এক বা দু'দিনের বেশি থাকবে না। পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলেও এড়িয়ে যাবে। যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে, সেটা সম্পন্ন করে আসা চাই। পুরন্দর হেড কোয়ার্টার্সের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে। এই শহরে পূজ্যপাদদের অনেক যজমান। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী। ইচ্ছে করলে, তাঁদেরই মধ্যে কারও বাড়িতে পুরন্দর থাকতে পারে। তা হলে অনেক টাকা বেঁচে যায়। কিন্তু পূজ্যপাদরা তা চান না। পুরন্দরের কিছু করার নেই। ওদের নির্দেশ মানতেই হবে। ছোটবেলা থেকে ওকে সেটাই শেখানো হয়েছে।

সোফায় আধশোওয়া হয়ে পুরন্দর ভাবতে লাগল, কাল বিকেলে মিউজিয়মের উল্টোদিকে, গির্জার গেটেও যখন দাঁড়িয়েছিল, তখনও ভাবতে পারেনি, প্ল্যান অনুযায়ী কাজটা অত সহজে করতে পারবে। হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশমতো, সুশোভন বলে একটা বয়স্ক লোকের পিছু নেওয়ার জন্য ও দাঁড়িয়েছিল। ওকে বলা হয়েছিল, এই সুশোভন বলে লোকটা মিউজিয়মের ভিতর থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে আসবে। লোকটা সল্টলেকে থাকে। তার বাড়িটা চিনে রাখতে হবে। তারপর, রাতে সেই বাড়িতে গিয়ে একটা ছবি উদ্ধার করে আনতে হবে। যদি বেগড়বাই করে, তা হলে লোকটাকে খতম করে দেওয়ারও নির্দেশ ছিল। কিন্তু একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরও যখন বয়স্ক লোকটা বেরিয়ে এল না, তখন হঠাৎ ফোন এল, সুশোভন বলে লোকটার পিছু নেওয়ার দরকার নেই। ওর জন্য সাদা পাঞ্জাবি পরা একটা লোক সদর স্ট্রিটের দিককার গেটের সামনে অপেক্ষা করছে। তার পিছু নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরের চোখ



পড়েছিল, সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকটার দিকে।

লোকটার নাম যে জয়দেব, পুরন্দর সেটা জানতে পারে অনেক পরে। একটা অল্পবয়সি ছেলে, লোকটাকে ডেকেছিল 'জয়দেবদা' বলে। কয়েকটা কথা বলে সেই ছেলেটা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর, হতাশ হয়ে জয়দেব পশ্চিমমুখো হাঁটতে শুরু করে। তখন পুরন্দর ওর পিছু নেয়। পাতালরেলে ওরা একই কামরায় ওঠে। এইভাবে ফলো করতে করতে ও যখন কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছায়, তখন হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন আসে, জয়দেব সম্পর্কে খোঁজখবর নাও। বইয়ের দোকানগুলোর কাছেই একটা চায়ের দোকান। সেখানে বসে গল্প করতে করতে, পুরন্দর আধঘণ্টার মধ্যেই জয়দেব সম্পর্কে যা জানার, জেনে নেয়। পরে হেড কোয়ার্টার্সকে সব জানানোর পর, ওঁরা বলেন, লোকটা যাতে ভয় পায়, তার ব্যবস্থা করো। রাতের বেলায় ওর দোকানে আগুন লাগিয়ে দাও।

একটা মানুষ মেরে ফেলা পুরন্দরের কাছে জলভাতের মতো ব্যাপার। আগুন লাগানো ওর কাছে কোনও কাজই নয়। গত দশ বছরে হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে ও অনেক মানুষকেই মেরেছে। তার জন্য ওর কোনও পাপবোধও নেই। দোকান থেকে জয়দেব বলে লোকটা, দু'টো ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নেমে গিয়েছিল রাত আটটার সময়। বইপাড়ার ওই গলিটা রাত ন'টার মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। একটা বাড়ির গাড়িবারান্দায় পুরন্দর ততক্ষণ শুয়েছিল। ওই দোকানটায় আগুন লাগানোর জন্য ওকে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। পুরনো দিনের বাড়ি। ভেন্টিলেশনের জন্য কাচের জানলাটা ও আগে থেকেই দেখে রেখেছিল। জানলা সরিয়ে, বইয়ের গাদায় আগুন লাগাতে ওর হাত এতটুকুও কাঁপেনি। এমন নিঃশব্দে কাজটা ও সেরেছিল, সম্ভবত কেউ টেরও পায়নি।

জয়দেবের অপরাধ কী, পুরন্দর সেটা জানে না। প্রশ্ন করার অধিকারও নেই ওর। কিন্তু এটুকু ও জানে, লোকটা নিশ্চয়ই ওর পূজ্যপাদদের অবমাননা করেছে। না হলে ওকে ভয় দেখানোর প্রশ্ন উঠত না। এটা প্রথম অপরাধের শাস্তি। এরপরের শাস্তি মৃত্যু। বিছানায় শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে পুরন্দরের শরীরটা শিথিল হয়ে আসছিল। ঝটকা মেরে ও উঠে বসল। এখন ঘুমিয়ে পড়লে ঘণ্টা চার-পাঁচেকের আগে ওর ঘুম ভাঙবে না। কোলে মার্কেটে যে লোকটা ওকে টাকা দিতে আসবে, সে ফিরে গেলে খুব মুশকিল হবে। তার থেকে ভাল, টাকাটা নিয়ে এসে দুপুরে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া। প্ল্যান বি-র কাজটা ওকে আজ রাতেই সারতে হবে। দুপুরে টানা বিশ্রাম নিয়ে নিলে, রাতের দিকে ঘুম পাবে না।

তার আগে স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে নেওয়া দরকার। বাথরুমে যাওয়ার জন্য পরনের জামাকাপড় খুলে ফেলল পুরন্দর। তারপর নগ্ন শরীরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কোনও একটা কাজ সেরে আসার পর হস্তমৈথুন করা পুরন্দরের বরাবরের অভ্যেস। বীর্যপাত করার পরই ও নিশ্চিত হয়ে যায়, কাজটা সুসম্পন্ন হয়েছে। নেহাতই কুসংস্কার। আর এরকম বহু কুসংস্কার নিয়ে শিশুবয়স থেকে ও বেড়ে উঠেছে পুরীর মন্দির সংলগ্ন এক ধর্মীয় আশ্রমে, কঠিন অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে। কৈশোরেই ওকে বলে দেওয়া হয়েছিল, নারীসম্ভোগ করার জন্য ওর জন্ম হয়নি। দেবসেবার জন্য ওর জীবন উৎসর্গ করা হয়েছে। কোনও নারীর সঙ্গে যদি কোনওদিন ও সহবাস করে, তা হলে ওর ভয়ংকর চর্মরোগ হবে। দেবতার রোষে সেই চর্মরোগ কোনওদিনই সারবে না। সারা শরীরের ক্ষত, আমৃত্যু ওকে বয়ে বেড়াতে হবে। ওই আশ্রমেরই ওপরতলায় তালিম দেওয়া হত দেবদাসীদের। চোখের সামনে অসামান্যা সুন্দরী নর্তকীরা ঘুরে বেড়াত। তাদেরই একজন, অম্বালিকাকে দেখে পুরন্দরের তীব্র কামচিন্তা হত। কিন্তু বহুবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, তাকে স্পর্শ করার দুঃসাহস কখনও হয়নি পুরন্দরের।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই নিজের লিঙ্গটা নিয়ে খেলা করতে লাগল পুরন্দর। স্নানসিক্তা অম্বালিকার নগ্ন দেহটা ও চিন্তা করতে লাগল। পাকা ডালিমের মতো ঠোঁটে ও চুম্বন করতে থাকল। গাঢ় চুম্বন কামনায় ওর নিশ্বাস ভারি হয়ে এল। কল্পনায় চুম্বন করতে করতে মুখটা ও নামিয়ে আনল অম্বালিকার স্তন পর্যন্ত। সুডৌল স্তন দু'টির কথা ভাবলেই পুরন্দরের যৌনইচ্ছা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। স্তনে কিছু সময় হাত বোলানোর পর, অম্বালিকার ঈষৎ বাদামি স্তনবৃন্ত দু'টি মনে মনে চুষতে লাগল পুরন্দর। কিন্তু আশ্চর্য, অন্যদিন ওর লিঙ্গ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আজ তা হল না। অম্বালিকার সরু কোমরটা ধরে, মনে মনে ওকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিল পুরন্দর। কিন্তু অনুভব করল, লিঙ্গে কোনও উত্তেজনাই টের পাচ্ছে না। হতাশ হয়ে ও বিছানায় বসে পড়ল।

তা হলে, কাজে কি কোনও গাফিলতি হল? দেবতা কি রুষ্ট হলেন?

কিন্তু ওর মতো পুরুষেরা চট করে হাল ছেড়ে দেয় না। মিনিট কয়েক পরেই পুরন্দর ফের উঠে দাঁড়াল। ও তো আর পাঁচটা সাংসারিক পুরুষের মতো নয়। কঠিন ধাতু দিয়ে তৈরি। ওয়ারড্রোব থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে তাই, বাথরুমে ঢুকে পড়ল পুরন্দর। প্রায় তিন মাস হল, ও আশ্রমের বাইরে। কাজ উপলক্ষেই প্রায় একমাস ও ছিল মায়াপুরের এক মন্দিরে। সেখানকার গেস্ট হাউসে হঠাৎই ভুল করে অন্য এক অতিথির ঘরে ও ঢুকে পড়েছিল। তখনই ও এক বিদেশি নারীর নগ্ন শরীর দেখে। সেই নারী সঙ্গম করছিল এক স্থানীয় পুরুষের সঙ্গে। বিদেশিনীর পা দু'টি সেইসময় পুরুষটির কাঁধের ওপর বেড় দেওয়া। তার শীৎকার ধ্বনি, রতিতৃপ্তির চূড়ান্ত মুহূর্তটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল পুরন্দর। ওরা টেরও পায়নি, একজন বহিরাগত ওদের সঙ্গম দেখছে।

নিঃশব্দে পুরন্দর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। জীবনে সেই প্রথম, ওরও ইচ্ছে হয়েছিল নারীসঙ্গম করার। কিন্তু নিজেকে ও নিবৃত্ত করে। ঘরে ফিরে হস্তমৈথুন মারফত শরীরের উত্তেজনা কমায়। হয়তো নারীসঙ্গমের সেই ইচ্ছেটাই ওর অবচেতন মনে লুকিয়ে রয়েছে। নারীর তপ্তশরীর না পেলে ওর লিঙ্গ দৃঢ় হবে না। হয়তো সেই কারণেই মনোসংযোগে সাময়িক বিচ্যুতি ঘটছে। কথাটা মনে হওয়ার পরই নিশ্চিন্তে পুরন্দর শাওয়ারের নীচে এসে দাঁড়াল।

হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশমতো, আজ রাতে ওকে যেতে হবে উল্টোডাঙার এক ছাপাখানায়। প্রভাবতী প্রিন্টিং হাউসে। ওখান থেকে একটা ছবি ওকে খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। ছবিটা ছাপার জন্য ওই প্রেসে পাঠিয়েছে জয়দেব নামে লোকটা। পূজ্যপাদ পদ্মনাভ ফোন করে সকালে পুরন্দরকে বলেছেন, ছবিটা চৈতন্যদেবের। ওটা উদ্ধার করতে না পারলে, সমূহ বিপদ। ছোটবেলা থেকে এই লোকটাকেই ঘৃণা করতে শেখানো হয়েছে ওদের। বলা হয়েছে, গৌড় থেকে আসা শ্রীচৈতন্য নামে এই লোকটা উৎকল সমাজকে একশো বছর পিছিয়ে দিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা হরিনাম করতে বলে, একটা বীরজাতির সর্বনাশ করেছে। এই লোকটার জন্যই একটা সময় কলিঙ্গ রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তার ভক্ত আর অনুগামীদের বিনাশ করাই পুরন্দরদের একমাত্র কাজ। এই লক্ষ্যে সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর মতো আরও তেষট্টি জন। ওরা অবশ্য কেউ কাউকে চেনে না।

বাথরুম থেকে বেরতে না বেরতেই দরজায় টকটক শব্দ। হোটেলে কেউ ওকে বিরক্ত করুক, পুরন্দর তা চায় না। হোটেলের ঘরে ঢোকার আগে, বাইরে 'ডু নট ডিসটার্ব' লেখাটা ঝুলিয়ে দেয়। এই সময়টায় তো কারও আসার কথা নয়! কোনওরকমে পুরন্দর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে নিল। দরজা খুলে ও দেখল, পুলিশ। সঙ্গে হোটেলের রিসেপশনিস্ট। পুরন্দর অবাক হলেও, মুখে তা প্রকাশ করল না। উল্টে, বিরক্তির সুরেই জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

রিসেপশনিস্ট ছেলেটি বলল, 'স্যর রুটিন চেকিং। কলকাতায়



জঙ্গিহানা হতে পারে। তাই মুচিপাড়া থানা থেকে ইনি এসেছেন। বাইরে থেকে আসা গেস্টদের সঙ্গে হোটেলে কথা বলতে।'

তা হলে আগুন লাগার তদন্তে আসেনি! এটা জেনে পুরন্দর হালকা বোধ করল। তারপর বলল, 'ঘরের ভিতরে আসবেন, নাকি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'চলুন, ঘরে বসেই কথা বলা যাক।'

ঘরে ঢুকে পুরন্দর বলল, 'কাল রাতে একদম ঘুমোতে পারিনি। এখানে এত মশা, জানতাম না।'

পুলিশ অফিসারটি বললেন, 'তাই নাকি? টানটান বিছানা দেখে তো মনে হচ্ছে না, আপনি শুয়েছিলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল পুরন্দর। লোকটাকে দরজা থেকে বিদায় করে দিলেই ভাল হত। কিন্তু কথায় ওর সঙ্গে পারা মুশকিল। পুরন্দর সে ভাবেই নিজেকে তৈরি করেছে। ও চট করে বলল, 'আমার কোমরে একটা ব্যথা আছে। নরম গদিতে শোওয়া বারণ। তাই কাল মেঝেতে শুয়েছিলাম।'

'আপনার নাম?'

হোটেলে হোটেলে ওকে নাম বদলাতে হয়। এই হোটেলে ও কী নাম দিয়েছে, সেটা মনে করার জন্য দু'তিন সেকেন্ড সময় নিল পুরন্দর। সোফায় জায়গা করে দেওয়ার জন্য কিট ব্যাগটা সরিয়ে নেওয়ার অজুহাতে। তখনই ওর মনে পড়ে গেল। ও বলল, 'মৃদুল ত্রিপাঠী। গাজিয়াবাদ থেকে এসেছি। বৈশালি এরিয়ায় থাকি।' বৈশালি নামটাই পুরন্দরের মনে পড়ল। কেননা, একবার ওখানে ও গিয়েছিল।

'আই সি। আপনি ইউপি-র লোক, অথচ এত ভাল বাংলা বলছেন কী করে?'

মুখটা হাসিতে ভরিয়ে পুরন্দর বলল, 'বলতে পারব না কেন? আমার মা যে বাঙালি! তাছাড়া, আমার বাবা জন্মেজয় ত্রিপাঠী কলকাতায় বহুদিন চাকরি করে গিয়েছেন।'

'আপনি কী করেন?'

'ব্যবসা। তবে এবার ব্যবসার কাজে আসিনি। আমার এক মাসতুতো বোন বাড়ির অমতে একটা ছেলের সঙ্গে এখানে পালিয়ে এসেছে। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, ফেরত নিয়ে যাব। নিচু জাতের ছেলের। বুঝতেই পারছেন, বাড়ির অমত কেন! আমাদের ওখানে জাতপাতের ব্যাপারটা খুব বেশি। এটা আপনারাও নিশ্চয়ই জানেন?'

'আপনার মাসতুতো বোন এখানে কোথায় আছেন, জানেন?'

'ঠিক জানি না। তবে শুনেছি, কাঁকুড়গাছিতে ছেলেটার এক আত্মীয় থাকে। সেখানে উঠতে পারে।'

'মিঃ ত্রিপাঠী, কতদিন থাকবেন এখানে?'

'দু'তিনদিন তো বটেই। তেমন পরিস্থিতি হলে আরও কয়েকদিন থাকতে হতে পারে।'

'আপনার সঙ্গে কি আর কেউ এসেছেন? কোনও মহিলা?'

'না। কেন বলুন তো?'

'না, বিছানার ওপর বেগুনি রঙের সিল্কের একটা কাপড় দেখছি, তাই জানতে চাইলাম।'

'ওহ, ওই পট্টবস্ত্রের কথা বলছেন? এখনই স্নান সেরে পুজোয় বসব।'

পুলিশ অফিসারটি উঠে পড়লেন, 'ওকে মিঃ ত্রিপাঠী। এখন চলি। মাসতুতো বোনের ব্যাপারে যদি প্রয়োজন মনে করেন, তা হলে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। তবে মেয়েটি সাবালিকা হলে, আমাদের কিছু করার নেই।'

পুলিশ অফিসারটি চলে যাওয়ার পর পুরন্দর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ও সিদ্ধান্ত নিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। একগাদা মিথ্যে কথা বলেছে। পুলিশ যদি মনে করে, ওকে ধরে ফেলতে পারে। গাজিয়াবাদ পুলিশকে ফোন করে ওর প্রতিটি কথা ভেরিফাই করতে পারে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে পুরন্দর বেগুনি পট্টবস্ত্রটা পরে নিল। এইবার প্রভু জগন্নাথের পুজোয় বসবে। ঠিক তখনই ফের ডোরবেলের শব্দ। পুজোয় বারবার বাধা পড়ছে। বিরক্তিতে ওর মন ভরে গেল। দরজা খুলে পুরন্দর দেখল, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এক হিজড়ে।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

অলংকরণ শান্তনু দে

র‍্যান্ডম, যারিচ্ছে, ভাবনা লোফালুফি

দক্ষিণী চিত্রতারকা খুশবু কিছু কথা বলেছিলেন বচ্ছর চার আগে, যা নিয়ে পেল্লায় হইচই ঘটেছিল। কথাগুলো ছিল ভারতের যৌন শুচিবায়ুকে নিয়ে। উনি বলেছিলেন, আজকের যুবক-যুবতীদের মধ্যে এসব বাই কমে আসছে, প্রায় সকলেই বিয়ের আগে যৌনতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এবং সে ব্যাপারটা ভালই। সারা দেশ জুড়ে মোট তেইশটি মামলা রুজু হয় খুশবু-র নামে। এখন সুপ্রিম কোর্টে ফের শুনানি শুরু হয়েছে। এই তো জানুয়ারির মাঝামাঝি, যেই না কোর্টে পড়ে শোনানো হয়েছে খুশবু-র সেই বিতর্কিত ইন্টারভিউয়ের একটা অংশ—'কোনও শিক্ষিত পুরুষই আর এমন গোঁ ধরে থাকেন না, যে, তাঁর বউকে কুমারী হতেই হবে'—অমনি একজন চিফ জাস্টিস ও দু'জন বিচারক সমন্বিত বেঞ্চ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ধমকে উঠেছেন এই মর্মে, 'মহোদয়া, কৌমার্য বিষয়ে এই প্রবল জ্ঞানগর্ভ বিবৃতিটা দেওয়ার কি খুব দরকার ছিল?' এই যে হুশ করে উঠে আসা আন্তরিক প্রতিক্রিয়া, আদালতের মতো গ্রাম্ভারি জায়গাতেও আর না-পেরে কথাটার গলা বেয়ে এসে বায়ুস্তর ধাক্কিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়া, এতে এ-আপত্তিটার আদি শিকড় বোঝা যায়। না, শিকড়টা যৌন রক্ষণশীলতায় নয়, নজর করতে হবে এই নিষেধের থিম-টা, যার ঝুরি নেমে গেছে বহু মাইল। সেটি হল : এতটার কি আদৌ দরকার ছিল? লিমিটের মধ্যে থাকলেই হত। ইন্টারভিউ দিচ্ছ, অ-বিতর্কিত, থোড়-বড়ি, সকলকে তুষ্ট রাখা চাট্টি কথা বলে স্টেজ থেকে নেমে পড়লেই হত। অন্য সব্বাই তো তা-ই করে। শুধু শুধু আগ বাড়িয়ে লোককে চটানোর কি খুব দরকার ছিল? বাঙালি মধ্যবিত্তর ভীষণ চেনা লাগে না কি এই কথাগুলো, এবং তরতাজা শুনতে পাওয়া যায় না কি বাদামি বৈঠকখানায় মা-বাবার ঈষৎ বিরক্ত ও উষ্ণ খিচখিচে টোন : এটার কি দরকার ছিল? বা, এতটা বাড়াবাড়ির কী দরকার ছিল?

মজার এ ঘরসংসার। ধানখেতে হাত-ধরাধরি করার অপরাধে মেয়েটিকে পঞ্চায়েতসভায় প্রেমিকের গালে জুতো মারতে হয় এবং তার মাথা কামিয়ে দিতে হয়, 'ভিখিরিটা আমার মোবাইল চুরি করেছে' চিৎকার শুনে কিচ্ছু যাচাই না-করেই সব্বাই বারো বছরের ছেলেকে ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে, বড় অফিসার গেট দিয়ে ঢুকতে গেলে দারোয়ান যেই তার আই-ডি দেখতে চায়, অফিসার তাকে ঠাটিয়ে তিন থাপ্পড় মারে এবং পরদিন দারোয়ানটির জেল হয় শান্তিভঙ্গের অপরাধে। এই সব জিনিসই সব্বাই সাধারণত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে। অনেকের খারাপও লাগে। হয়তো হাত-পা'র পেশিগুলো ফট করে গুটলি পাকিয়ে উঠে একটা কোনও ক্রিয়ায় সামিলও হতে চায়। কিন্তু তখনই বাই ডিফল্ট হৃদয়ে ব্লিপ ব্লিপ করে চমকাতে থাকে অমোঘ মৌলিক প্রশ্ন, যার সাপেক্ষে নির্ণীত হবে, তালু বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে সামনে প্রসারিত হবে, না কি সুড়সুড় করে পকেটে সেঁধিয়ে নিশ্চিন্ত ঘামে বুড়বুড়ি কাটবে। সেই প্রশ্ন হল : আমার কি এই ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার দরকার আছে? উত্তরটাও জানা। নেই। কিচ্ছুরই দরকার নেই। যতক্ষণ না তোমার নিজ ঘাড়ে সমূহ রদ্দা এসে পড়ছে, যতক্ষণ না ব্লেড দিয়ে কেউ তোমারই শিরা চিরে তাতে ফুরফুরে বিটনুন ছড়িয়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ রুমাল দিয়ে সিকনি মুছে ফের সে রুমাল কুঁচকিতে ঢুকিয়ে রাখা ছাড়া কিচ্ছুরই দরকার নেই। অ্যাক্সিডেন্টে কে রাস্তায় চোখ উল্টে রক্তের পুকুরের মধ্যে পড়ে আছে, তোমার দরকার কী? কলেজে পড়তে ঢুকেছ পড়াশোনা করবে, স্টুডেন্টস ইউনিয়নে নাম লেখাবার দরকার কী? ওই বাড়িতে বাপিদা বউদিকে পেটাচ্ছে, তুই চুক চুক করে একটু শব্দ করে মাথা নেড়ে শুয়ে পড় না, ওদের ব্যাপারে নাক গলাতে যাওয়ার দরকার কী? গোয়ার সমুদ্রসৈকতে ন'বছরের রুগ্ন বালিকাকে ধর্ষণ করার দু'দিন পর অপরাধী অফিসে আসে, কিছু কলিগ তাকে বলে, পালা পালা, তোকে খুঁজছে। অন্যরা মন দিয়ে আকাশ দেখতে থাকে। কে শালা কাকে ধর্ষণ করল, তার কচি অবুঝ শরীরটা ফালাফালা করল, আমার দরকার কী? গেরস্থ তার দরকার আঁকড়ে সন্তর্পণে বাথরুমে যায়। টানা, লম্বা পেচ্ছাপ করে সে, বেশ ফর্সা পেচ্ছাপ,



সামান্য খিচখিচ ওতেই ভেসে যায়।

ইয়ার্কির জায়গা নয়। এ হল মধ্যবিত্তের নীতিশিলা। এই বাক্য ঠেকিয়ে সে যুগ-যুগ সন্তানের ন্যাজ ধরে টেনে রেখেছে। নির্বিরোধী, মাংকি ক্যাপ পরা বাবুকে সবাই ভালবাসে। সাতে নেই, পাঁচে নেই, পঁয়ত্রিশে নেই, এক দশমিক চারে নেই, সন্ধে হলেই লুঙ্গি গুটিয়ে সে আসন্ন মুড়ি ও নংকার কথা ভাবে। সে জানে, জীবন একটি ছানাবড়া পোকা, না-ঘাঁটালে ঠিক আছে, কিন্তু ঘাঁটাতে গেলেই কখন যে ফোঁওঁওঁস গা ফুলিয়ে কাঁটা ও কানকো বের করে তেড়ে আসবে, বাপ রে। ছেলে যতক্ষণ ডিবেটে নাম লেখাচ্ছে সে দিব্যি হাসি-হাসি মুখে মাথা নাড়ে, আবার মাউন্টেনিয়ারিং-এ ভর্তি হলেই হাঁ-হাঁ করে তেড়ে যায়। এ আবার কী? তুই কি সবেতেই এক্সপার্ট হয়ে উঠবি না কি? নেমে আয়। ছেলে শিক্ষা পায়, নিজের ইচ্ছের গলা কেটে তাকে ধরাকাটের মধ্যে থাকতে হবে। ছোটমেয়ে মুখ লাল করে এসে মায়ের আঁচল টেনে বলে, বরানগরের কাকু তার ফ্রকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মা ধমকে বলে, এখানে চুপ করে বোসো। একদম ও-ঘরে যাবে না। এবার থেকে ও এলে সাবধানে থাকবে। মেয়ে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। শিক্ষা পায়, অন্যায় দেখলে তার মুখোমুখি হবে না, সিঁটিয়ে সরে আসবে। 'ফুটপাত দিয়ে বাইক চালাচ্ছেন কেন!' বলবে না। ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে, 'সরি' বলে দোকানঘরে সেঁধিয়ে যাবে। বাইক অনেকটা দূরে চলে



গেলে, তখন গালাগাল শুরু করবে, 'এরা রাস্তাটাকে বাপের মনে করেছে।' জীবনের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার কী দরকার বাবা!

এই নিজের ছিপি পাক দিয়ে নিজেকে এঁটে রাখা, আত্ম-বনসাই, নিজের গলা দু'হাত দিয়ে টিপে ধরে রাখা, এ হল মধ্যবিত্তের ট্রেডমার্ক। এবং এই মানসিকতা থেবড়ে আছে গোটা দেশে। আর, পরস্পরের দিকে চোখাচোখি করে লোকে এটাকেই করে তুলেছে সবচেয়ে স্বীকৃত ও পছন্দসই মনোভঙ্গি। কৌমার্য নিয়েও বাতেলা মেরে দরকার নেই, মৌলবাদ নিয়েও। মারকুটে সম্প্রদায়ের কাছে হাতজোড় করে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা ভাল। মেগাস্টারের ছবিকে লিখিতভাবে খারাপ বলার দরকার নেই। খাদানের শ্রমিক চাপা-পড়া নিয়ে প্রাথমিক হইচইয়ের পর আর তদন্ত কোরো না। যদি বা মোমবাতি-মিছিলে যাও, ওগো শুনছ, মিছিলের মধ্যিখানে থেকো, আগায় বা পিছনে নয়, লাঠিচার্জ হলে ওসব জায়গায় মাথায় বাড়ি কম্পালসরি। হ্যাঁ, এ কম্বলজড়ানির সর্বাধিক কারণ তো, অফ কোর্স, ঠ্যাঙানির ভয়। ইভ-টিজিং থামাতে গেলে, প্যান্ডেলের মাইক-চিল্লানি রাত বারোটায় থামাতে গেলে, দিওয়ালি-র সন্ধেয় বড়লোক ফ্যামিলির ল্যান্সডাউন ব্লক করে তুবড়ি পোড়ানো থামাতে গেলে থাবড়া খাওয়ার ভয় আছে। চাকরিতে অমুক বেচারির প্রতি অন্যায় নিয়ে বসের কাছে তদ্বির করতে গেলে নিজের চাকরিটি সহসা উড়ে পালাবার ভয় আছে, মানুষের প্রতি অত্যাচার নিয়ে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে গেলে নিজে সহস্র গারদ-শিকে জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে। এবং আমাদের সরকার, আমাদের পুলিশ, আমাদের আদালত বছর-বছর ধরে পরিকল্পিত ভাবে এই আবহাওয়াটা তৈরি করেছেন, আমাদের মেরুদণ্ড ওভারটাইম খেটে কুপিয়ে থেঁতো করেছেন, অন্যায়কারীর বুক ফুলিয়ে ঘোরা ও প্রতিবাদকারীর ক্ষুর-খাওয়া টুঁটি নিয়ে পথপাশে লেবড়ে থাকা গ্যারান্টি করেছেন, যাতে এই সমাজের মানুষ পাশের লোকটা খুন হলে মুখ ফিরিয়ে থাকে, যাতে রিগিং হলে নতমুখে লাইনে দাঁড়িয়ে নখ খোঁটে, যাতে এগারোটা ছেলে অবরোধ করলে এগারো হাজার বাসযাত্রী টুঁ শব্দটি না করে নিজ-সিটে পাছা থেবড়ে বসে থাকে। এবং এই আত্মসম্মান-ধ্বংসী ব্যবহার-সিরিজের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে, নিজেকে এতটুকু প্রয়োগ করতে গেলেই নিজের বকলশ টেনে ধরতে-ধরতে, নিজেকে অক্ষম, নিচু, নিদন্ত ঠাওরাতে ঠাওরাতে ভারতবাসী প্রিয় পাশবালিশ পেয়ে গেছে এই অজুহাতকে : অন্য সকলেই তো এরম করছে, একা আমি অন্যরকম করতে গেলে কি কোনও লাভ হত?

এবং তাই সে কিছুই করে না। অন্যের অন্যায়ে অনবরত সই দিয়ে যায়। কী দরকার বাবা অশান্তি বাড়িয়ে? একা আমি কিছুই করতে পারব না ভেবে একশো কোটি লোক এ ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে চরম অপরাধ করে চলে। আর বারবার দাবি করে, আমি নিজে কিন্তু ভাল। এই তত্ত্ব ভজতে ভজতে সে টুক করে ঘুষও খেয়ে নেয়। জিগ্যেস করলে বলে, আমি না খেলে অন্য একজন খেত। ওরাও তো দেখছিল গোল হয়ে, ওরাও তো বাঁচাতে পারত। আমাকে বলছ কেন? আরে, তুই নিজে তোর কর্তব্য করিসনি কেন? পাঁজাকোলা করে হাসপাতালের দিকে ছুটিসনি কেন? সিনেমা দেখতে চলে গেলি কেন? না, ওরাও তো করেনি। বোঝো। ওরা তো তোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ও কিচ্ছু করেনি, আমি করব কেন? তার বেলা? 'ডিজেল গাড়ি পরিবেশের সবচেয়ে ক্ষতি করে, জানিস' বলে নিজের নতুন কেনা ডিজেল গাড়ি চড়ে টা-টা করে বেরিয়ে গেল। আমি না কিনলে অন্য কেউ কিনত। তাই আমি খুনটা করলাম। অন্য কেউ সুপারি পেত, কী দরকার পৃথিবী কমপ্লিকেট করে? আরে অন্য কেউ গু খেত না অমৃত চাখত সে সাফাই তোর ঢাল কী করে হয়? তুই নিজে নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করাচ্ছিস না কেন? নিজের



বিবেকবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছিস না কেন? ধুর, তা হয় না কি? যেটুকু দরকার সেটুকু করেছি। নিজের ছেলেকে বিক্কিরি করিনি। বাকি কোথায় কে কীভাবে বস্তি উচ্ছেদ করছে আমার কী দরকার? ওইদিনটা মায়া লাগছিল, একদম সামনে ওদের পেটাচ্ছে, মালপত্তরগুলো দমাদম ছুড়ে ফেলছে, আগুন লাগাচ্ছে চালে, আমি আড্ডা মারতে মধ্যমগ্রাম চলে গেসলাম। এখন বস্তি বুজিয়ে রম্য পার্ক তৈরি হয়েছে, আমি যাব না নাতির আঙুল ধরে বেড়াতে? কী মুশকিল! অমন দৃঢ়বদ্ধ নীতিনিষ্ঠা তো স্ব-কনস্টিপেশন, আঁটো বিষ্ঠা! আমি তো শৈশব থেকেই শিখে গেছি নিজের টানটান ছিলাটা ল্যাতল্যাতে করে বাঁচতে।

এই হাড়কাঁপা ভয়, ভণ্ডামি, ভালুক-জ্বর, এ থেকেই চুঁইয়ে গেছে অন্যরকম, বাড়াবাড়ি-রকম, বেশি-পাকা-রকম না হওয়ার শিক্ষা। বেশি ভাবতে যাওয়া ভাল নয়। নিজের মতামত, নিজের ইচ্ছে, নিজের নীতিকে অনুসরণ করে যাওয়া ভাল নয়। চিন্তা করা মানে, পরিচিত পাঁকালপাড়া পেরিয়ে অন্য অঞ্চলে হাঁটা লাগানো। না-চেনা গাছ, না-জানা পেত্নি। রিস্কি। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প ছিল, বাচ্চা মেয়েকে বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়ানো হয়েছে। তিনি কত



দয়ালু ছিলেন। পরনের ধুতিটা অবধি বিলিয়ে দিলেন খোঁড়া ছেলেটিকে। মেয়ে বিহ্বল। পরদিন পার্ক থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে দ্যাখে হি-হি করে কাঁপছে গরিব মানুষ। তাকে দামি কার্ডিগান দিয়ে ফিরে এল। বাড়ি এসে এই মার কি সেই মার। তোর বিদ্যাসাগর হওয়ার কী দরকার ছিল? এখানে গ্রেট-টা হল, মেয়ে সত্যি এমন উদার হয়ে গেলে আমাদের মেটিরিয়াল লস। তা ছাড়া সে আমাদের মতো ভেতর-গুঁজড়োনো আত্ম-প্যাঁচানো নিঘিন্নে দীন হবে না কেন? সবার মতো হ। রসগোল্লা খেয়ে ভাঁড় ধুয়ে তুলে রাখতে শেখ। কে তোকে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার রাস্তায় কদম রাখতে বলেছে? কে তোকে বলেছে নিজের ভেতর টর্চ ফেলে তদন্ত করতে, চুনকাম-সারাই-সাফসুরতি জারি রাখতে? শুধু ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, অশিক্ষা, টিকটিকির মতো ভ্যাটভ্যাট করে তাকিয়ে থাকা গুলে আমরা যে মহা-পাঁচন তৈরি করেছি, তার মধ্যে গুবগুবিয়ে থাক বাপ। এখানে জলটল মাপা আছে। এস্কিমোদের সঙ্গে ছ'মাস ইগলু-যাপন করবি এ অ্যাম্বিশন নিয়ে কেউ রজনী জাগে? বরফে চারটে আঙুল ভাজা হয়ে যাবে, তখন কে দেখবে?

সৎ হওয়া ভাল, তবে লিমিট রেখে। যেখানে বখেড়া বাধতে পারে, শুধু প্রথাগত ভাবে সৎ থাকাই যথেষ্ট। মানে, বেশ তেত্রিশ কাউন্টে অসৎ থাকা। যখন ম্যাগাজিনে চিঠি আসে, 'আমি কুমারী নই, স্বামীকে ফুলশয্যার দিন বলব কি?' আগের মতো উত্তর হয় না, মুরগির রক্তে তুলো ভিজিয়ে ভরে রাখুন ইত্যাদি, উত্তর হয়, 'চেপে যান।' স্বামীও জিগ্যেস করে না, ঔদার্যে নয়, ভয়ে। পাছে সত্যি বেরিয়ে পড়ে, তা মনোমতো না হয়। সত্য খুঁড়তে বেদনা বের করার দরকার কী? খুশবু-র এই কটাং সত্যিকথায় তাই সকলের রাগ। যা জানো তা নিজ-বগলে নিয়ে বসে থাকো না। ফটরফটর করার দরকার কী? আমাদের এক শিক্ষক বলেছিলেন, সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা এত ভাল কেন জানো? পুরো পরিবার মিলে বসে দেখা যায়। এই হল ভারত। আর কিছু কারণে অত বড় ফিল্মমেকার ভাল নন, নিরাপদ বলে ভাল। এখানে যাহা নিরাপদ, তাহা সর্বোত্তম। সবচেয়ে স্বস্তিকর, প্রীতিপ্রদ সার্টিফিকেট : ইহা নিরাপদ। নিরাপদ শিল্প, নিরাপদ ইন্টারভিউ, নিরাপদ আমিও ভাল-তুমিও ভাল বিবৃতি, নিরাপদ প্রশস্তির আসর। নিরাপদ রেটিং। সবাই যা জানে, বক্তৃতায় তা-ই বলে সিওর হাততালি কুড়িয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া। আড্ডায় বুঝেসুঝে কথা বলা। কলাম-এ বুঝেসুঝে সেফ টার্গেট আক্রমণ করা। যা লিখলে হইহই হতে পারে, তা কেটে দেওয়া। আমার ওপর কি ভুবনের ভার আছে না কি? বস সেক্রেটারির নামে ভুল তথ্য বলছে জেনেও চুপ করে উদ্যত কারেকশন গিলে নেওয়া। সে কী গো, যা সত্যি বলে ভাবব, তা বলব না? না, বলবে না। খামোকা অপ্রিয় হয়ে যাবে। হয়তো পুরস্কার পেতে আগামীবার। আর পাবে না। হয়তো প্রোমোশন হত মার্চে। কেঁচে যাবে। এমনকী ফ্লার্ট-ও নিরাপদ লেভেল মেনে করবে। অনুরাগ অনেকটা রাস্তা চলে গেলে, নির্জন জায়গা পেয়ে ঝোঁক জেঁকে বসলে পরে হ্যাপা পোয়াতে হতে পারে। অন্যরকম স্বভাবটাকে কাঁইচি দিয়ে ছেঁটে নাও ভাইসকল। নিজেকে প্রশ্ন করো, 'এতটার কি দরকার আছে?'

ভয় পাও। ভয়। অন্যরকম হওয়ার ভয় হল সবার কাছে গ্রহণীয় না-থাকার ভয়। কটরকটর কথা বলার ভয় হল অন্যের আঘাতের লক্ষ্য হয়ে যাওয়ার ভয়। নিজের মতো হওয়ার ভয় হল শেষবেশ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে এদের কাছ থেকে দ্বিগুণ প্যাঁক খাওয়ার ভয়। শুধু ভয়। তাই, এমনকী যাদের ডিগনিটি আছে, যারা নীতিকে নিত্যি ফুল চড়িয়ে চলে, তারাও বিশ্বাস করে পরোক্ষ লেফট হুক-এ। ছিটকে, সটকে, সরে আসে। অভিমানে রিজাইন করে। তর্জনী তুলে শয়তানটাকে বলে না, তুমি যে আমার নামে এমন কথা বললে, তার প্রমাণ কী? অধিকার কোত্থেকে পেলে? না। বরং কান্না চেপে, অল্প গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, আমি রিজাইন করলাম। আমি নিজেকে সরিয়ে নিলাম। তোমরা সুখে থাকো। বাংলা সিনেমার দুয়োরানি টাইপ। খুশবু অনায়াসে গ্রীবার একটা রমণীয় ভঙ্গি করে চুল ঝাঁকিয়ে বলতে পারতেন, নো কমেন্টস। বলতে পারতেন, আমার গয়না নিয়ে প্রশ্ন করুন। কিংবা অমিতাভ বচ্চন কতটা গ্রেট। কোথায় ভীতির ডিমে তা দিয়ে প্রীতি কুড়োবেন, তা না, তিনি আঙুল খুঁচিয়ে ভিমরুলের চাক চেনাতে গেলেন। মর এবার। আদালত সুদ্ধু বলছে, কী দরকার ছিল, মহোদয়া? জেমস ওয়াট-এর মা-ও বলতে পারতেন, কেটলির ঢাকা উথলোচ্ছে তো উথলোচ্ছে, তোর তা থেকে তত্ত্ব বার করে যন্ত্র বানাতে যাওয়ার দরকার কী বাপ? চা-টা ঢেলে খেয়ে ফ্যাল না। নিউটনের মা বলতে পারতেন, আপেলটা ঘাড়ে পড়েছে, কামড় লাগা বাছা, জ্যাঠামি মেরে আবার কার্য-কারণ খতাতে বসলি কেন? রামমোহনের মা বলেছিলেন, তোমার বউদি সহমরণে গেছে, কারণ এটা নিয়ম। পেছনপাকামি মেরো না। চেঁচামেচি কোরো না। দেখা যাক শেষ অবধি ভারতমাতা খুশবু-কে কী বলেন।



কলকাতার অলিগলির নামরহস্য

বটকৃষ্ণ পাল অ্যাভিনিউ

১৯১৮ সালে কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা আহিরিটোলা অঞ্চলের উন্নতির জন্য দু'টি সড়ক প্রস্তাব করে। যার প্রথমটি, আহিরিটোলা ডায়াগোনাল, প্রথমে চিৎপুর থেকে নিমতলা ঘাট স্ট্রিট অবধি যায় ও পরে ১৯৩৮ সালে চিৎপুর থেকে পুবে গ্রে স্ট্রিট পর্যন্ত বাড়ানো হয়। ১৯৩৮ সালে এই নতুন তৈরি ডায়াগোনাল রোড কলকাতা পৌরসভার কাছে হস্তান্তরিত হলে অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী বটকৃষ্ণ পালের নামে এটির নাম হয় বটকৃষ্ণ পাল অ্যাভিনিউ। ১৯১৪ সালে কলিকাতা পৌরসভা ডালগোলা বস্তি উচ্ছেদ করে একটা উদ্যানের সুপারিশ করেছিল কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছে। ১৯৩৮ সালে এই উদ্যানটিরও নাম রাখা হয় বটকৃষ্ণ পাল স্কোয়ার। হেদুয়াতে বটকৃষ্ণের মর্মর মূর্তি আছে। দমদম রেল স্টেশনের কাছে বি কে পাল অ্যান্ড কোং-এর যে কারখানা আছে তারই কাছে প্রসারিত হয়েছে বি কে পাল লেন।

বাঙালি ওষুধ ব্যবসায়ীদের অন্যতম পথিকৃৎ বটকৃষ্ণ পাল (১৮৩৫-১৯১৪) সামান্য আফিমের ব্যবসায়ী থেকে পরিণত হন বি কে পাল অ্যান্ড কোং এর স্বত্বাধিকারীতে। অনাথ অবস্থায় ছোটবেলাতেই বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে মামাবাড়িতে আসেন ও সেখানে মানুষ হন। মামা রামকুমারের চিৎপুরের নতুন বাজারে মশলার দোকানে ১২ বছর বয়স থেকে শিক্ষানবিশি শুরু করেন। ১৬ বছর বয়সে মামার দোকান ছেড়ে চিৎপুর রোডে ছোট্ট আফিমের দোকান খোলেন। আফিম থেকে পাট, পাট থেকে মশলা। বটকৃষ্ণ এরপর বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে যেমন এদেশে বিলিতি ওষুধ আমদানি করতে থাকলেন, তেমনি দেশি ফর্মুলায় ওষুধ তৈরি করে দেশে বিদেশে নানা জায়গায় রপ্তানি করলেন। এসবই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার আগে।

শিবপুরে বটকৃষ্ণ একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা বি কে পাল ইনস্টিটিউশন নামে খ্যাত হয়। বেনিয়াটোলায় ছেলেমেয়েদের জন্য দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাগার, গুদাম ও দোকানের জন্য জমি কেনা ও বাড়ি তৈরি চলতে থাকে। ওষুধের গুদাম হয় ১৬ ও ১৭ নম্বর পুরনো চীনেবাজার স্ট্রিটে, ১ নম্বর বনফিল্ড লেনে থাকে ওষুধের দোকান, ৩৯ নম্বর শোভাবাজার স্ট্রিটে বসতবাড়ি ও ওষুধের দোকান। ১৮ নম্বর শশী সুর লেন পরীক্ষাগার হিসেবে থাকে। বটকৃষ্ণের ছেলেরা ওষুধ-ব্যবসাকে বাড়িয়ে দাঁতের চিকিৎসা, চোখ ও শল্য চিকিৎসা, অ্যারারুট চাষ, যন্ত্রপাতি মেরামত, আয়ুর্বেদ ওষুধ বানানো, ম্যালেরিয়ার ওষুধ তৈরি ইত্যাদি আরও ১৬টি বিভাগ চালু করেন। ১৯০৯ সালে ইংলন্ডের 'কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট' পত্রিকা বি কে পাল অ্যান্ড কোম্পানি সম্বন্ধে বলে, Truth is stranger than fiction, but would anybody believe that this Indian firm sells more pharmaceutical preparations than any other chemists' shop in the world?

সংকলন : ঈপ্সিতা হালদার



কলকাতার গলিপথ



STARTED SMALL
PLAYED IT BIG
MADE IT LARGE
SEAGRAM'S
ROYAL
STAG
MEGA MUSIC
IT'S YOUR LIFE. MAKE IT LARGE.
O&M 467
Music CDs
ONE WAY